বেগম নাজমা ফ্লাংকাইন

বেদুইন

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭২ ।। মে ১৯৬৫

প্রচ্ছদ
বিভূতি সেনগুপ্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৭, হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা ৯, জ্ঞানোদয় প্রেসে মুদ্রিত

বন্ধুবর মনোমোহন মুখোপাধ্যায়কে

এক

ঘটনাটি শুনেছিলাম জর্জি ফ্রাংকাইনের মুখে।

দূর প্রাচ্যগামী জাহাজের ব্রীজে বসে, কখনও বা তার কেবিনে বসে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সে বলে চলেছে, আমি নির্বাক শ্রোতার মত মাথা নেড়ে সমঝদারি করেছি। গল্পের গভীরতার চেয়ে বলবার ভঙ্গীটি ছিল বেশী মনোহর।

কেমন করে যে পরিচয় হয়েছিল তার সাথে সেটাই বলছি। সহজ সরল কথায় এই পরিচয় হয়েছিল আকস্মিকভাবে। ভাসা-ভাসা কথোপকথন, কোন হৃদ্যতা ছিল না তাতে, বরং আমার পক্ষ থেকে ছিল বিরক্তিকর উদাসীনতা। প্রথম পরিচয়টা অবান্তর মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই পরিচয় যে তার মনের গহন কোনে টেনে নিয়ে যাবে, এ চিন্তা মনেও জাগেনি কখনও।

প্রথম সমুদ্রযাত্রায় থাকে উত্তেজনা। প্রথম রাত্রিতে যে উত্তেজনা ছিল তার ভগ্নাংশও অষ্টম রাত্রিতে ছিল না। বিগত সাতদিন সাতরাত্রির সমুদ্র আর দূরের বন্দর জীবনটাকে একঘেয়ে করে তুলেছিল। বড়ই একঘেয়ে, আর এই একঘেয়েমি ক্রমশ ব্যাকুল করে তুলেছিল মাটির আশ্রয় পেতে। শুধু জল আর জল। লোয়ার ডেক্ আর আপার ডেক্ উঠানামা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলুম। রাতের বেলায় হোটেলে বসে খেতুম। ভরাপেটে ব্রীজে এসে বসতুম। কেমন উন্মনা হয়ে যেতুম ব্রীজে বসলে। সহযাত্রী অনেকেই ঘুমোবার আগে প্রথম রাতেই এসে বসত ব্রীজে। স্বল্প পরিসর স্থানে গায়ে গা দিয়ে স্বদেশীয় ভাষায় স্বজনদের সাথে গাল-গল্প করত। কলগুঞ্জন চলত। কেউ গলা ছেড়ে সুর ভাঁজতো। কেউ কেউ হাস্যপরিহাসে সমুদ্রযাত্রার ক্লেশ লাঘব করত।

সমুদ্র ছিল শান্ত, সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত জনসংখ্যা ছিল-ই না। রাতের আসর মোটামুটি জমতো। খোলা আকাশের তলায় মিঠে বাতাসে আনন্দের লহর ভেসে বেড়াত। সেই আনন্দের আমিও ছিলাম অংশীদার।

রাতের গভীরতা বৃদ্ধি পেলে প্রকৃতির বুকে নেমে আসত অস্বস্তিকর গাম্ভীর্য। ক্রমেই ব্রীজের ভীড় কমে, ধীরে ধীরে সবাই নেমে যায় লোয়ার ডেকে। ঘড়ির কাঁটা বারটা পার হলেই ব্রীজ খালি হয়ে যেত। তখন নিজেকে পেতুম সম্পূর্ণ এককভাবে। নিঃসঙ্গের শূন্যতা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতুম, দৃষ্টি থাকত দিগন্তে। মনের কোন হদিস পেতুম না। মন ছিল আরও দুরন্ত আরও তীব্রগতি সম্পন্ন।

সে রাত আমার সমুদ্রযাত্রার অষ্টমরাত্রি। সিঙ্গাপুর পেরিয়ে জাহাজ ছুটছে উত্তর-পূর্ব কোণ বরাবর। আকাশে ছিল কৃষ্ণপক্ষের ছায়া, আঁধারী আকাশে বসেছিল তারার মেলা; তারাগুলো ছিল স্পষ্ট, বাতাসে ছিল জোয়ারী গন্ধ, নিস্তব্ধতাকে ব্যঙ্গ করছিল ইঞ্জিনের ঝকঝকানি। মাঝরাতে যাত্রীরা এলিয়ে পড়েছে ঘুমের কোলে, মাঝেমাঝে খালাসীরা সতর্কভাবে চলাফেরা করছিল পেছনের ব্রীজে, নইলে সারা জাহাজখানা ছিল ঘুমন্ত।

বিগত ক'রাতেই এইভাবে বসে থেকেছি। আকাশে শুকতারা দেখা দিলে নিজের আশ্রয়ে ফিরে গেছি। এইভাবে বসে থাকতে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। স্বয়ংসৃষ্ট পরিবেশকে ভালই লাগতো। এই রাতেও আগের মত নির্লিপ্ত উদাস মন নিয়ে বসেছিলুম; দর্শনীয় কিছুই নাই, উদাস দৃষ্টি প্রসারিত ছিল দিগন্তে, যেন শূন্যতার মাঝে মহাশূন্যের অনুসন্ধানী সেই দৃষ্টি।

ক্লান্তি এসেছে মনে, মনের ক্লান্তি জড়িয়ে ধরেছে দেহকে। ঘুম নেমে এসেছে দুচোখ ভেঙ্গে। আড়িমোড়া ভেঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মানুষের ছায়া আমাকে ডিঙ্গিয়ে ব্রীজকে স্পর্শ করল। ফিরে তাকালুম। কিছু দূরে কেবিনের মৃদু আলোতে দেখা গেল একটি মনুষ্যমূর্তি। মনে হল পাথরের একটি খোদাই করা মূর্তি কেবিনের মৃদু আলোর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে পথভ্রান্ত করতে চাইছে। দূরত্ব বেশি নয়, তবুও বুঝতে পারলাম না কোন দেশীয় সে। অবশ্য জানবার আগ্রহও ছিল না, প্রয়োজন তো নয়ই। মুখ ফিরিয়ে লোয়ার ডেকের দিকে পা বাড়ালাম। পাথরের মূর্তিও নড়ে উঠল। এগিয়ে এল আমার দিকে। থমকে দাঁড়ালাম।

সচল মূর্তি জোর কদমে এসে দাঁড়াল আমার পাশে। ডান হাত সমুদ্রের দিকে প্রসারিত করে বলল, হাউ নাইস্!

চমকে উঠলাম। উত্তর দেবার কোন চেষ্টা না করে লোয়ার ডেকের দিকে আবার পা বাড়ালাম। অনুভব করলাম কে যেন আমার ডান কাঁধ স্পর্শ করেছে। থমকে দাঁড়ালুম। মনে হল কোন অশরীরী আমাকে জাপটে ধরেছে। ত্বরিতে ফিরে দাঁড়াতেই দেখলাম অতি সুপুরুষ সুঠাম-দেহী যুবক, হয়ত আমারই বয়েসী। কোন উচ্যবাচ্য না করে অপেক্ষা করছিলুম পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য।

মুখে তার মৃদু হাসি। এ হাসি অনেকের মুখে আগেও দেখেছি। শুকনো হাসিতে আত্মবঞ্চনার বিজ্ঞাপন। তার আচরণে বিরক্তি বোধ করলেও তার ঐ হাসিটুকু আমার মনের কোন দুর্বল তন্ত্রীতে আঘাত করে আমাকে সংযত করল। বিরক্তি প্রকাশ করবার ভাষা হারিয়ে ফেললাম। তার ঐ বিষণ্ন হাসি ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলল আমাকে।

আমার দৃষ্টিতে ছিল জিজ্ঞাসা। চোখের ইঙ্গিত সে বোঝে। মৃদু স্বরে বলল, রাগ করছ?

বললাম, ওটাই স্বাভাবিক। আমার কথায় বেশ ঝাঁজ ছিল। বলার পর খেয়াল হল, ও ভাবে না বললেই ভাল হত।

মাথা নাড়ল সে। বিনীত কণ্ঠে বলল, হুঁ। ক্ষমা চাইছি। কেমন যেন মনে হল তোমাকে, হয়ত হত না। রোজই মাঝরাতে তোমাকে ব্রীজে বসে থাকতে দেখি। কৌতূহল জাগল মনে। ভাবলুম, জিজ্ঞাসা করি, কেন? তাই এলুম, নইলে ছুটে আসতুম না। কিসের আকর্ষণ বলতে পার? এর আগে কাউকে তো তোমার মত বসে থাকতে দেখিনি। হোয়াট ড্রাগ্‌স্ এণ্ড হোয়াই।

অসংলগ্ন কথার খেই হারিয়ে সে থেমে গেল। পাগল নয়তো। চিন্তিত না হয়ে পারলুম না। আবার কতকগুলো অবান্তর প্রশ্ন ওর মনে জাগবে আবার আরম্ভ করবে অসংলগ্ন কথা। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিলুম। সেই বাধা দিল। সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কথা বলছনা কেন? ভাল লাগল না বুঝি?

বললাম, সমুদ্রকে দেখি।

জবাবটা তার মনঃপূত হল না। হাসল সে, বলল, রাতের সমুদ্র খুবই

সুন্দর। তবে আঁধারী রাতে নয়। আকাশ রইবে পরিষ্কার, আকাশে কোলে ভেসে বেড়াবে রূপোর রূপ নিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ, সেই চাঁদের আলো রূপোর ঢেউ ছড়িয়ে দেবে সমুদ্রের বুকে। সে সমুদ্র তুমি দেখনি। হাউ বিউটিফুল্!

মুখ ঘুরিয়ে বললাম, সো ইট্ সিমস্।

থেমে গেল সে। কি যেন ভাবছিল। রাতের সেই নিস্তব্ধতার মাঝে প্রকৃতির শূন্যতাকে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশে অপরিচিত মানুষটিকে মোটেই সুখকর ভাবতে পারছিলুম না। কোন রকমে তার সম্মুখ থেকে সরে যেতে পারলে যেন বেঁচে যাই।

হয়ত সে বুঝেছিল আমার মনের কথা। তার মুখে ফুটে উঠল সেই হাসি। ক্ষীণ সেই হাসির রেখা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। অতি আপন জনের মত বলল, মাপ্ কর। মানুষকে বুঝতে আমাদের কত না ভুল হয়। জানতো, ভগবানও ভুল করে, নইলে তুমি-ই বা মাটির নেশায় পাগল কেন, আর আমি-ই বা জলের নেশায় পাগল কেন! নাথিং সিরিয়াস্।

দাঁড়িয়ে রইলাম তার পাশে। আশঙ্কা ছিল আরও কিছু আধ্যাত্মিক তথ্য সে শোনাবে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমার আপাদ মস্তক দেখল।

মৃদু প্রশ্ন, কোথায় যাবে?

সপ্রতিভ উত্তর, ইয়াকোহামা।

আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলল, ভেরি নাইস্।

আবার সেই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। শোনা যাচ্ছে শুধু ইঞ্জিনের ঝক্-ঝকানি।

আমার প্রশ্ন, তুমি?

তার উত্তর, জলে।

মৃদু প্রতিবাদের স্বরে বললাম, বুঝলাম না হেঁয়ালি!

নো, নট্ সো। জলের বুকে ভেসে বেড়ানো আমার পেশা, নেশাও বলতে পার। জাহাজে জাহাজে পাড়ি জমাই দূর দূরান্তে, অনির্দিষ্ট পরিকল্পনাহীন আমার যাত্রা। এ না হলে বাঁচতুম না। অবশ্য এ বাঁচাও মৃত্যুর নামান্তর, তবুও সান্ত্বনা। বলতে বলতে গলায় শব্দ যেন আটকে গেল।

অনুযোগের স্বরে বললাম, হিংসা হয়।

কেন? কেন?—উত্তেজিতভাবে বলে উঠল।

যদি তোমার মত ভেসে বেড়াতে পেতুম।

মোস্ট য়ান্ লাকি। ইংরেজি প্রবাদ, রোলিং স্টোন্ গ্যাদারস্ নো মস্। তাই হত তোমারও। আমি ভুক্তভোগী। ভাসবার যন্ত্রণা আমি জানি। জলেই ভেসেছি, ভাসছি; ভাসতে ভাসতে জীবনের সব কিছু ভাসিয়ে দিয়েছি। ডোণ্ট্ বি সো সিলি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

তা ঠিক নয়। তুমি হয়ত ভেসেছ, আমি ভেসে বেড়াতে চাই।

আকাশের দিকে অপলকে চেয়ে থেকে বলল, আই রিমেমবার।

কি? উন্মুখভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

ও কথা বলতে পারব না। ভাঁসা আর ভেসে বেড়ানোতে পার্থক্য খুব নেই। বাট্ আই রিমেমবার। হোয়াট য়ফুল।

উত্তর দিলাম না। এগিয়ে গেলাম সিঁড়ির দিকে। পেছন ফিরে দেখি সে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। রয়েছে মুখ উঁচিয়ে আকাশের দিকে। বিদায় সম্ভাষণ অথবা শুভরাত্রি না জানিয়েই নেমে এলাম লোয়ার ডেকে, খোলের রাজ্যে। জাহাজের খোলের রাজ্য হল মানুষের চিড়িয়াখানা। সারা দুনিয়াতে যারা স্বপ্ন দেখে উপার্জনের আর ঘুম ভাঙ্গলে লড়াই করে খুদকণা লাভের আশায় তারাই প্রয়োজনের দায় মেটাতে স্থান করে নেয় খোলের রাজ্যে। মানুষ্যসঙ্কুল এক অভিনব প্রাণীজগৎ, বিভিন্নতায় ঐক্যসূত্র জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিছানা গোঁটানো-ই ছিল। ছুটে এসে পেতে নিলুম, এলিয়ে দিলুম দেহটাকে। মাথার উপরেই এয়ারপ্যাসেজ্। হু-হু করে তুফান বইছে বাতাসের। বড়ই মিঠে বাতাস, ঘুমিয়ে পড়লাম বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে।

খোলের মানুষের কাছে সকাল-সন্ধ্যার কোন আলাদা অর্থ নেই। লুপ্‌হোল্ খুলে না দিলে দিনের আলোর সাথে পরিচয় হয় কমই। বিজলি বাতি রাতকে দিন করে দিনকে রাত করে। আপার ডেক্ থেকে নেমে স্থির করে নিতে হয়, রাত্রির আঁধারকে রেখে এসেছি উপরে যখন ঘুম ভাঙ্গবে তখন হবে দিন। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দিনের আলোর সাথে করতে হবে নতুন পরিচয়।

পরিচয় করতে উঠে এলাম উপরে। ঘড়ির কাঁটা দেখে বুঝে নিলাম রাতের ঘুম পুষিয়ে নিয়েছি দিনের বেলায় খোলের গহ্বরে।

সামনে খোলা আকাশ। দৃষ্টির শেষ সীমা অবধি জল আর জল যাত্রীজীবনের নবম দিনেও তার পরিবর্তন ঘটেনি। মনে হল, আজ সামান্য চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কেমন একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে যাত্রীর ঘোরাফেরা করছে। খালাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা এত ব্যস্ত কেন?

মুখ তুলে চেয়ে দেখল। থামল। হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল পেছন দিকটা। ঝড়ের পূর্বাভাস মনে করে আকাশের দিকে তাকালুম। কোথাও মেঘের কোন চিহ্ন দেখলুম না। সামনে চেয়ে দেখি সমুদ্র যেন আটকে গেছে কালো রেখায়। সামনেই তটভূমি, নিশ্চয়ই বন্দর রয়েছে। নবম-দিনে মাটির মুখ দেখবার সম্ভাবনা। খুশী হলাম।

ইতিমধ্যেই খোলের চিড়িয়াখানায় বাঁধাছাঁদা শুরু হয়েছে। সামনের বন্দরে যারা নামবে তারা গুছিয়ে নিচ্ছে তাদের সংসার। দিন দুইতিন রইবে জাহাজ; নেবে মিষ্টি জল, নামবে যাত্রীরা, হয়ত উঠবেও। মাল নামবে, হয়ত উঠবেও। তাই চঞ্চলতা, সেই চঞ্চল্য ধীরে ধীরে অস্থিরতার মোড় নিয়েছে। সংসার নিয়ে নামবার যাত্রীরা উপরে উঠেছে। খোলের রাজ্য অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে। দুপুর বেলায় গা এলিয়ে দিলুম খোলের আশ্রয়ে। সহযাত্রীদের কলকোলাহলে ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করতে করতে জাহাজ ভিড়ল বন্দরে।

জাহাজের গায়ে সিঁড়ি লাগল। যাত্রীরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। ভীড় জমেছে ডাঙ্গায়। স্বজনকে ফিরে পাবার আশায় অধীর প্রতীক্ষা করছে তারা। আপার ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম নামার ব্যস্ততা।

আজকের মত জাহাজের গতি স্তব্ধ। যাত্রীরা নেমে গেছে সন্ধ্যার আগেই। যারা শহর দেখবার অনুমতি পেয়েছে তারাও নেমে গেছে। গুটিকয়েক যাত্রী আর জাহাজের কর্মচারী এপাশ ওপাশ করে বেড়াচ্ছে। ব্যস্ততা নেই কোথাও। কেমন মন্থর হয়ে গেছে জাহাজী জীবন। ইঞ্জিনের ঝকঝকানি তখন বন্ধ।

রাত এগিয়ে চলেছে। হোটেলের সাথে দেনা পাওনা মিটিয়ে এসে বসলাম ব্রীজে। সামনে সুরম্য নগরী, আলোর মালা দিয়ে সাজানো। ছোট ছোট নৌকা যেন হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে জাহাজটার পানে।

ষ্টীমার ছুটে চলেছে সম্মানজনক দূরত্ব রেখে। আঁধারী রাত যেন আরও বেশি আঁধার, হয়ত বা অমাবস্যার রাত। বসে রইলাম একাকী, সম্বল রইল মনের শূন্যতা।

রাত এগোচ্ছে।

আনমনা বসে রয়েছি। কানের কাছে ভেসে এল, টু ডে অলসো।

চেয়ে দেখলাম কালকের সেই মানুষটি। ধীরে ধীরে এসে বসল আমার পাশে। তার সুঠাম গৌরবরণ দেহটাকে কেবিনের আলোতে সামান্য দেখা যাচ্ছিল। তার উপস্থিতিটা প্রীতিপ্রদ মনে হয়নি, তাই ভাল করে তার দিকে চেয়ে দেখবার ইচ্ছাও ছিল না। উঠে যাবার ইচ্ছে ছিল ষোল আনা, তবুও কেন বা নীরবে বসে রইলাম।

ফিস্ ফিস্ করে বলল, অনভিপ্রেত সঙ্গী আমি, ইউ আর প্লিজিং এণ্ড নোবল্ বাট্ ইন্‌ডিফারেণ্ট। কি ভাবছ আজ। মে আই নো?

আমার ভাবনা তুমিই ঠিক কর।

আমি! নো গেসিং। বাস্তব কথা বড়ই কঠিন। তুমি তোমার প্রেমিকার কথা ভাবছ।

না, আবার চিন্তা কর।

তোমার মা?

নো, নো, লং পাস্ট্, আবার ভেবে নাও।

তোমার দেশ?

পার্টলি করেকট্। আমার দেশের কথা ভাববার লোকের অভাব নেই। ভাবছি তোমার দেশের কথা।

আমার দেশ! দুঃখিত। আমার কোন দেশ নেই। আই য়্যাম্ এ সিটিজেন্ অব্-দি-ওয়ারলড। আমি বাস করি জাহাজে। দুনিয়ার বাসিন্দা আমি।

হেসে বললাম, তোমার দেশ নাও থাকতে পারে, কিন্তু তোমার পিতা অথবা মাতার কোথাও তো দেশ ছিল।

ওটাও হাঙ্গামার কথা। তোমার অভিধানে আমি টেঁসো। পর্তুগীজ ছিল আমার ঠাকুরদা, ঠাকুমা ছিল মালাবারী নায়ার। আর আমার বাবা ছিলেন মিলার্ড ফ্রাংকাইন, মা ছিলেন মুসলমান গায়িকা, বাঈজিও বলতে পার। অব্‌নক্‌সাস্ নয় কি! চমৎকার নয় কি। অনুভব কর আমি কি এবং আমার কি হওয়া উচিত আর কোথায় আমার দেশ।

কি যে উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। তার পিতৃকুলের পরিচয়টা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা মনে হল। ভেবেই পেলাম না, মানুষ কোন পর্যায়ে এলে এমন অকপটে স্বীকৃতি দিতে পারে। আমার নীরবতায় বেশ অস্থির হয়ে উঠল সে। উত্তেজনার সাথে জিজ্ঞাসা করল, ডু ইউ হেট্ মি?

নো, নো এণ্ড নেভার। মানুষতো তার জন্মের জন্য দায়ী নয়। মানুষ দায়ী তার কর্মের জন্য। ইউ মে বি নোব্‌লার্ ছ্যান্ এনি বডি। তোমার কতটুকু জানি। তুমি যে সত্যকথা বলছ তারই প্রমাণ কি।

হো-হো করে হেসে উঠল সে। বেশ কিছুক্ষণ হাসিটা তার ঠোঁটে লেগে রইল। অবশেষে কাশতে কাশতে থেমে গেল। গম্ভীরভাবে বলল, প্রজিনি ভাল না হলে কর্ম ভাল হয় না, হতেই পারে না। ঠাকুরদা ছিল পাইরেট, তার রক্ত এখনও শুকোয়নি। মায়ের জীবন ঘৃণ্য নয় তবে নিষ্ঠুর। যার ফলে কর্ম আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আই য়্যাম্ এ স্কাউণ্ড্রেল, বিলিভ্ মি।

বাধা দিয়ে বললাম, আমার কাছে এসব অবান্তর কথা। তোমাকে বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করবার কোন কারণই নেই। আমি তোমার কথা কি জানি। য়্যান য়্যাকোনটেন্স ওনলি, তাও দুদিনের। এর ভিত্তিতে তোমার জন্ম বা কর্ম কোনটাই বিচার করা সম্ভব নয়। আর তা করব্যার আমার যেমন কোন যোগ্যতাও নেই, তেমনি অধিকারও নেই। মাপ্ কর। এ প্রসঙ্গ শুনতে চাই না।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

এগিয়ে এসে বিনীতভাবে বলল, অপরাধ নিও না। আমি মাটির দেশের লোক নই। মাটির দেশের ভব্যতা ভুলে গেছি। সমুদ্র আমাকে হাতছানি না দিলে হয়ত আমিও মানুষ হতে পারতাম। পাই-রেটের রক্ত সমুদ্রে টেনে এনেছে। য় ফুল!

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, জর্জি ফ্রাংকাইন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে। এখন রয়েছে শুধু ভয়ঙ্কর স্মৃতি। চমকে চমকে উঠি, সারারাত ডিউটি দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেও ঘুম আসে না। ঘুমের সাথে আমার দুষমনী। মনের কথা বলবার লোক পাইনা। য়্যফুল!

চলতে চলতে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াতেই সে হাত জোড় করে বলল, রাগ করনা মিস্টার—

অমল জানা।

মিঃ জানা! আই সি। গুডনাইট্, মাপ কর।

ত্বরিতে ফিরে গেল সে। আমি নেমে এলাম লোয়ার ডেকে

দুই

ব্রীজে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম শহরটা। সকালের স্নিগ্ধ আলোতে সুন্দর দেখাচ্ছিল বন্দর এলাকা। বন্দরের এই শহরকে লোকে বলে প্রাচ্যের ভেনিস। সুন্দর ও মনোরম।

জাহাজ এখানে তিনদিন দাঁড়াবে। কোন প্রোগ্রাম আছে তোমার মিঃ জানা?

হেসে বললাম, না, কোন প্রোগ্রাম নেই। ঐ মিস্টার শব্দটা আমার সহ্য হয় না। তার চেয়ে আমার নাম ধরে ডেকো, আমিও তোমাকে জর্জি বলে ডাকব।

জর্জিও হেসে বলল, ভেরি নাইস্। ঐ ফর্মালিটিগুলো আমারও সহ্য হয় না। তবে কার কি মন তাতো জানিনা। যাক্ ওসব কথা। চল আমার কেবিনে। দিনের আলোতে আমার কেবিনে বসে গল্প করব। কেমন!

উত্তর দেবার কোন অবসর না দিয়ে জর্জি হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে চলল তার কেবিনে। মৃদু প্রতিবাদ সে গ্রাহ্যই করল না।

তিন তলায় ছোট্ট কেবিন। একজন লোক কোন রকমে উঠাবসা করতে পারে। স্বল্প পরিসর তবুও বেশ পরিচ্ছন্ন। সাদা ধবধবে চাদর পাতা ছিল বিছানায়, টেবিলের ওপর রয়েছে ফিকে সবুজ ঢাকনা। ফুলদানিতে প্লাস্টিকের ফুল, একখানা আরসি আর চিরুণি রয়েছে সামনে। কয়েকখানা অল্পদামী ইংরেজি নভেল সাজানো রয়েছে একপাশে। মোটামুটি একজনের উপযোগী পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ভাল লেগেছিল কেবিনটা।

বললুম, বেশ পরিচ্ছন্ন তো।

ছোটবেলা থেকে থাকতুম হোস্টেলে। নিজের কাজ নিজেই করতে শিখেছিলাম। ওটা হোল নিজস্ব রুচি।

বিছানায় বসিয়ে জর্জি গেল নীচের তলায়। একাই রইলুম বসে। পাশের জানালা দিয়ে দেখছিলাম পেছনের উন্মুক্ত সমুদ্রকে। জর্জি ফিরে এল বয়ের হাতে খাবার নিয়ে।

বিনীতভাবে বলল, দুঃখিত, দেরী হয়ে গেল।

না, মোটেই নয়। ভদ্রতার মুখোস আমার ভাল লাগে না।

আমারও। আমরা গল্প করব, আমরা নিজেদের মাঝে নিজেকে ফিরে পাব, এখানে আবার ভদ্রতা কিসের? সারারাত এস-ও-এস নিয়ে ব্যস্ত থাকি। রাতের ডিউটি। আমি নিজেই বেছে নিয়েছি রাতের চাকরি। ডিউটি বদল আমি চাই-না। গ্রেহাম খুব খুশী, তার চিরকালই ডে ডিউটি। ইট্‌স্ ফর্ মি। হি ইজ্ গ্রেট্‌ফুল্। বন্দরে জাহাজ ভিড়লে তার হয় সোনায় সোহাগা। নাও, খেতে থাকো। লজ্জার কিছু নেই। উই আর ফ্রেণ্ডস্। বুঝলে! উই স্যাল বিহেব্ লাইক্ দ্যাট্।

সম্মতি অথবা অসম্মতি না জানিয়ে খেতে থাকি। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখছি সমুদ্রবিহারী বিহগকুলকে। উড়তে উড়তে কোনটা চিলের মত ছোঁ দিয়ে পড়ছিল জলের বুকে। বেশ লাগছিলো।

জর্জি আমাকে অন্যমনস্ক দেখে বলল, কি দেখছ?

খোলা আকাশ।

ওঃ। বলে জর্জি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খেতে খেতেই বলল, আমার কোন বন্ধু নেই। আমার নির্বান্ধব জীবনই দুঃখকে বড় করে তুলেছে।

প্রতিবাদ করে বললাম, এখুনি যে বললে, আমরা বন্ধু।

এই বোধহয় প্রথম। এর আগে কাউকে বন্ধু মনে করিনি। তবে মনে মনে বন্ধুত্ব কামনা করেছি অনেকেরই। প্রতিদান যা পেয়েছি, যাক্ শুনে কাজ নেই।

মনে মনে হাসলাম। কাজ যে নেই সে কথা আমিও বুঝি। আগ্রহ দেখানো অবান্তর। এক টুকরো রুটি মুখে দিয়ে বাক্ সংযম ঘটালাম।

জর্জি আগ্রহ সহকারে বলল, এবার আমাদের যাত্রাপথ চায়না সাগর দিয়ে।

জানি।

এটা হল কড়কড়ে পানির রাজ্য, যেমন ঝড়-তুফান, তেমনি স্রোত।

শুনেছি।

প্রথমবার যখন এসেছিলাম সেবার সে কি ভয়। মনে হয়েছিল, ঘর পালিয়ে না এলেই ভাল হত। ঘর আটকে রাখতে পারেনি। আমিও পারলুম না সেখানে থাকতে। এ মাদার, মোস্ট ক্রুয়েল বাট্ হলি মাদার। এ বাইজি, তবু সে মা। মাকে সহ্য করতে পারিনি। নট্ মাই ফল্ট্, জন্মদাতা পরিচয় দেবার কিছু রেখে যায়নি। মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি দেহের সৌষ্ঠব। এই সৌষ্ঠব আমার বেশি সর্বনাশ ঘটিয়েছে। আর পেয়েছি কেতাবী বিদ্যালাভের প্রচুর সহায়তা। কিন্তু সে এডুকেশন মিথ্যা এডুকেশন। রক্তের সাথে যে পাপ তাকে রোধ করবার মত এডুকেশন আজও কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। নইলে জর্জি মানুষ হতে পারত।

জর্জি থেমে গেল। খোলা জানালার মাঝ দিয়ে আকাশের দিকে নির্বিকার ভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, সূর্য যদি না উঠত!

লাভ?

কেউ আমাকে দেখতে পেত না। অন্ধকারের জীব অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকতে পেতুম। বাট্ এ হেল্, মাই ফ্রেণ্ড। আমার জন্মের আগেই বাবা ফতে হয়ে গেছেন। বিশ্বাস হয়নি। বাবাকে খুঁজেছি, পাইনি। মা বলেছেন বাবা নেই। ছিল কোনসময়, আজ নেই। জন্মে অবধি জেনেছি বাবা নেই। কুর্গের ইস্কুলে পাঠিয়েছিল আমাকে। মাসে মাসে টাকা আসত। বড় হয়ে জেনেছিলাম, মা-ই পাঠাতেন টাকা। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গেছি। ছুটির সময় সবার বাবা আসত, আসতনা শুধু আমার। প্রবল জিজ্ঞাসা জাগল মনে, কোথায় আমার বাবা। কোথায় আমার মা। কোথায় আমার ঘর। উত্তর দিত না কেউ-ই। অন্য কেউ হলে পাগল হয়ে যেত।

মিশনের ফাদার থমাস বলত, এই তোমার ঘর। তোমার বাবা স্বর্গের সেই সরল শিশুটি। ব্লেসেড্ ইজ্ হি।

বলতাম, মায়ের কাছে যাব।

ফাদার থমাস ইতস্তত করে বলত, সে নির্দেশও নেই। দরকার হলে তোমার মা আসবেন তোমাকে দেখতে।

চিৎকার করে বলেছিলাম, বাট্ সি ডাজ্ন্ট্ কাম্।

ফাদার হেসে বলত, রেগোনা খোকা, আমি তোমার মাকে আসতে লিখছি। তিনি শীগ্‌গীর-ই হয়ত এসে যাবেন।

বয়স যখন ছয় তখন এসেছিলাম ঐ মিশনে। তারপর পাঁচটা বছর কেটে গেছে, একবারের জন্যও মা আসেনি। মায়ের চেহারাটাও যেন ভুলে গেছি। পাইন গাছতলায় বসে বসে মায়ের চেহারাটা ভাবতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সবই ইন্‌ ভেইন্‌। মায়ের চেহারাটা মনেই পড়ত না। কেমন ধাঁধা সৃষ্টি হত।

আমি একাই বসে থাকতুম মাঠের কোনায়। সবাই যখন হৈ-হৈ করে খেলাধুলা করত, আমি তখন মাটিতে দাগ কেটে খেলার ছক্‌ তৈরী করতাম। সে ছকের হিজি-বিজি-ই বোধহয় আমার জীবনের হিজি-বিজির সূচনা।

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করত ফাদার থমাস্‌। মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যেত তার নিজের ঘরে। দেশ-বিদেশের গল্প বলত। বলত, 'মনুষ্য সেবার দায়িত্ব নিয়ে আমরা ছেড়ে এসেছি পিতা-মাতা স্বজনকে। কিছু ভাল কাজ করতে হলে অনেক ত্যাগের প্রয়োজন হয়।' কখনও কখনও খেলবার সরঞ্জাম হাতে তুলে দিয়ে মাঠে নামিয়ে দিত। সঙ্গীদের সাথে খেলায় মেতে ভুলে যেতুম আমার বেদনা। সেদিন না বুঝলেও আজ বুঝি, সত্যই ফাদার থমাস আমাকে অনুকম্পা করত। আমার হৃদয়-বেদনাকে সে বোধহয় শ্রদ্ধা করত।

বিদ্যালয়ের অফিসে দাঁড়িয়ে থাকতুম মাঝে মাঝে। মিশনের ছেলেদের চিঠি আসত বাবা-মায়ের কাছ থেকে। চিঠির প্রত্যাশায় তারা ঘুরত ফিরত। চিঠি এলে আনন্দে উৎফুল্ল হত তারা। আমার কোন চিঠি আসত না। তবুও মাঝে মাঝে অফিসে যেতুম, যদি বেড়ালের কপালে শিকে ছেঁড়ে,—এই প্রত্যাশায়!

একদিন ডাক পিওন এসে কেরানীবাবুকে মনিঅর্ডার ফরম দিল। ফরম পড়ে কেরানীবাবু বললেন, জর্জির টাকা এসেছে।

আমার টাকা! বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

তোমার নামে নয়, তোমার জন্য। পাঠিয়েছেন তোমার মা। এই দেখ, বলেই ফরমটা আমার হাতে তুলে দিল। পাঁচ ছয় বছরে বেশ কিছু লেখাপড়া শিখেছি, ফরমটা গর্‌গর্‌ করে পড়ে ফেললাম। পেলুম মায়ের নাম ও ঠিকানা। চুপি চুপি খাতার পেছনে লিখে নিলুম।

বিকেল বেলায় দারোয়ানের কাছ থেকে ধার নিলুম তিনটে পয়সা ডাকঘরে গিয়ে পোস্টকার্ড কিনে মাকে চিঠি লিখলুম।

কি লিখেছিলুম তা মনে নেই। আমার কাঁচা হাতের লেখার মাঝ দিয়ে নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছিল আমার হৃদয় বেদনা, নইলে মা হয়ত আসতেন না। সন্তানের ক্রন্দন মহানিষ্ঠুর মায়ের বুকেও স্নেহের সঞ্চার না করেই পারে না।

চিঠি ডাকে দিয়ে রোজই পিওনের আশায় অফিসের সামনে ঘোরাফেরা করতুম। রোজই ভাবতুম, এই বুঝি এল মায়ের চিঠি। নিরাশ হতাম রোজই। বিষণ্ণ মনে ফিরে গিয়ে বসতুম ক্লাশে। মাস্টার মশায়রা যা পড়াতেন তার এক বর্ণও কানে প্রবেশ করত না। সেই বয়সেই মানসিক ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়লুম। দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেল। নিত্যকার কর্তব্য পালন করতে সেদিনও দাঁড়িয়েছিলুম অফিসের সামনে, ফাদার থমাসের আর্দালী এসে বলল, 'ফাদার তোমাকে ডাকছেন।' ফাদার থমাস কাউকে ডেকে পাঠালে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত। আমি কিন্তু মোটেই ভয় পাইনি। তবে ছ্যাঁত করে উঠল মনটা। ভাবলুম, ফাদার বোধহয় খবর পেয়েছে আমার চিঠি লেখার।

সোজা এসে দাঁড়ালুম ফাদারের কামরায়। ফাদার তখন পায়চারি করছিলেন। সামনের চেয়ারে বসেছিলেন একজন মহিলা। আমাকে দেখেই ফাদার পায়চারি বন্ধ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অকল্পনীয় নীরবতা সেখানে, আমি বোকার মত রইলাম দাঁড়িয়ে। ফাদার থমাস ধীরে ধীরে বললেন, জর্জি, ডু ইউ নো হার ?—সি ইজ্ ইওর মাদার। বলেই আবার তিনি পায়চারি করতে লাগলেন, কেমন অস্থির মনে হল তাকে।

মা! চমকে উঠলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না। মূল্যবান একজোড়া বালা হাতে, গলায় হীরা বসানো একটা সোনার চেন, সাদা শাড়িতে সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখখানায় যেন চাঁদের স্নিগ্ধতা। দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কল্পনার মায়ের চেয়েও সুন্দর আমার মা। কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি এমন একটা সুন্দর মাকে, কোথায় যেন দেখেছি মনে করতে পারলাম না।

মা হাত বাড়িয়ে বললেন, এস বাবা।

আমি পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, বললাম, তুমি-ই আমার মা।

হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি।

কিন্তু কেন, কিন্তু কেন, বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম।

মা-ও ফুঁপিয়ে উঠলেন। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম মায়ের বুকে।

মাতা-পুত্রের এই মিলন দেখবার মত সেখানে ছিল ফাদার থমাস। সেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কান্না যখন থামল তখন সস্নেহে আমার কপালে চুমো দিয়ে বলল, দুঃখ কর না জর্জি। পৃথিবীতে সইতে হয়। সইতে না পারলে সংসারে চলতে পারবে না।

সত্যি কথা ঐ একটি। টলারেশন। সহনশীলতা নইলে চলতে পারবে না। ইউ ফাইট্, ইউ গেইন্, শেষ অবধি দেখবে ইউ ল্যুজ্।

ফাদার থমাস আসতেই মা বললেন, আমি যে ক'দিন হোটেলে থাকব সে ক'দিন জর্জি আমার কাছেই থাকবে। তারপর আবার ফিরে আসবে।

মায়ের সাথে এলাম হোটেলে।

মায়ের ব্যক্তিগত ঝি-চাকর বাদেও হোটেলের ঝি-চাকরের দল সর্বদা সন্ত্রস্থ থাকত আমার পরিচর্যা করতে। মিশনে ছিল বাধা নিষেধ, সেই বাধানিষেধ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একেবারে শিথিল হয়ে গেল। আমি যেন এক নতুন জগতে এসেছি। নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করতে লাগলুম।

মায়ের সব কাজকর্ম করত রাঘবন। বিকেল বেলায় তার সাথে যেতুম বেড়াতে। শহরের একোনা-সেকোনা বেড়িয়েও তৃপ্তি পেতুম না, আরও কিছু নিশ্চয়ই রয়েছে দেখবার ও জানবার। রোজই মনে হত অনেক কিছুই না দেখে, না জেনে ফিরে এসেছি হোটেলে। ছয়টা বছর কেটেছে মিশনের চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী অবস্থায়, সেই বন্দিত্ব সাময়িক ভাবে ঘুচে গেছে। পূর্ণ স্বাধীনতার সুখ উপলব্ধি করতে বেরিয়ে পড়তুম রোজ বিকেলে। এমন উন্মুক্ত একটা জীবন যে থাকতে পারে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

রাঘবন মায়ের সাথেই হায়দ্রাবাদে থাকে। সেও কুর্গের উপকণ্ঠে এলাচের ক্ষেত দেখে খুশীতে ভেঙ্গে পড়ত। গল্প বলত হায়দ্রাবাদের, বলত নিজামশাহীর ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের কথা। বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম। রাঘবন যখন গল্প বলত তখন কিং আর্থারের আজব কাহিনীর চেয়েও সুন্দর মনে হত। তার গল্পকথা যেন গোগ্রাসে গিলতাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠা মাত্র হোটেলের ভৃত্যের দল খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াত দরজায়। মা থাকতেন পাশের ঘরে। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙতো তাঁর। আমিও সকালের খাবার খেয়ে খোলা জানালায় গিয়ে বসতাম। নীচের রাস্তায় তখন ব্যস্ততা, গাড়ি-ঘোড়া ছুটত অনবরত। আমি বসে বসে ঐ সব দেখতাম। মায়ের ঘুম ভাঙলে রাঘবন এসে ডেকে নিয়ে যেত। আমি ছুটে যেতাম মায়ের কামরায়।

প্রথম দিন হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম। যে মাকে মিশনের অফিসে দেখেছিলুম, সে মা যেন হারিয়ে গেছে। জড়োয়া গহনার চাকচিক্য, মেক-আপ্ করা চেহারার জৌলুস, এসব আমার ও মায়ের মাঝে কেমন ব্যবধান সৃষ্টি করত। অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে পিছিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম প্রথম দিন। বুঝতে মোটেই ভুল করেননি তিনি। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল তার মুখ। ঐ একটি দিনই মাত্র, তারপর আর কোন ভাবান্তর কোন পক্ষেই হয়নি। উভয়েই যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

যাই বল, মায়ের অমন সাজ সজ্জার তলায় মাতৃত্ব কিন্তু ঢাকা পড়ত না। সেই মায়ের ইউনিভ্যারস্যাল্ রূপটি ফুটে উঠত আমার চোখের সামনে। আমি ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই মা ছুটে এসে বুকের সাথে চেপে ধরতেন। কপালে চুমুর পর চুমু এঁকে দিয়ে স্নেহের আলপনা ফুটিয়ে তুলতেন। আজও ভেবে পাচ্ছিনা। যে মায়ের বুকে এত স্নেহ লুকিয়ে ছিল সেই মা কি করে দূরে ঠেলে রেখেছিলেন আমাকে।

সেদিন ভাবতে পারিনি, ভেবেও খুঁজে পাইনে। আজও সেই কথাই ভাবি, যার মমতার প্রস্রবণে আমি শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস খুঁজে পেতুম সেই মমতাময়ী কি করে ছয়টি বৎসরে একবারও আমায় কাছে ডেকে নেয় নি। অদ্ভুত মনে হয়েছিল সেদিন ; আজও মনে হয়, তবুও একটা যুক্তি খুঁজে পেয়েছি এখন।

সেই স্নেহ-মমতা যে অভিনয় নয়, এর তলায় যে কোন কৃত্রিমতা নেই, একথা বিশ্বাস করতে এক যুগ কেটেছে আমার। সত্যকার মাকে খুঁজেছি। সেই মাকে খুঁজে আবিষ্কার করেছিলুম, তবে অনেক, অনেক বিলম্বে। তখন মায়ের প্রয়োজন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

দুপুর বেলায় হোটেলের দরজায় এসে দাঁড়াত দামী দামী গাড়ি। গাড়ির আরোহীরা ভীড় করত। হোটেলের বারান্দায়। দরজায় খবরদারি করত

রাঘবন। তারই অনুমতি নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করত অনেকে। কখনও দল বেঁধে মেয়ে-পুরুষ নামতো গাড়ি থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ফিরে গিয়ে উঠত তাদের গাড়িতে। সেই সময়টা মায়ের ঘরে যাওয়া মানা, আমি আমার ঘরে বসে দেখতুম, ভাবতুম, চুপ করে বসে থাকতুম।

বিকেলে বেড়াতে যাবার আগে মায়ের কাছে যেতুম। সেই সময় মা নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন, চুল আঁচড়ে দিতেন, গায়ের জামা বদলে দিতেন, কোন কোনদিন পায়ে মোজাও পড়িয়ে দিতেন। মা বেরতেন গাড়িতে করে, আমি বের হতাম রাঘবনের সাথে। মা যখন ফিরতেন তখন আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। টেরও পেতাম না কখন মা ফিরেছেন।

আমার এই সুখের দিনের সমাপ্তি এসে গেল। মায়ের ফেরবার তাগাদা, দেখতে দেখতে ফেরবার দিন এগিয়ে এল। বাঁধাছাঁদা শুরু হল, মায়ের কর্মব্যস্ততা কমে গেল। বিকেলে বের হবার আগে একদিন মা বললেন, আজ আর বাইরে যেও না জর্জি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন মা?

তোমার সাথে গল্প করব। সন্ধ্যার পরে বাজারে যাব তোমার পোষাক কিনতে।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললাম, আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিবে মা!

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আর একটু বড হও।

অভিমানের স্বরে বললাম, এই তো অনেক বড় হয়েছি। ফাদার থমাস বলেন, টলেস্ট, সবচেয়ে ঢ্যাঙ্গা, ঢ্যাঙ্গা কি বড় নয়।

মা গম্ভীরভাবে বললেন, টলেস্ট সব সময় বড় হয় না জর্জি, হয়ত স্মলেস্টও হতে পারে।

মায়ের কণ্ঠস্বরে ভীত হলাম। এই কদিনে একবারও মায়ের গম্ভীর গলার শব্দ শুনিনি, আজ হঠাৎ শুনে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম। মা বুঝলেন, হাসলেন, সে হাসি তুমি কখনও দেখনি অমল। এ মাদার স্মাইলস্। ওঃ, হেভেনলি। হেসে বললেন, দুঃখ করনা জর্জি। তোমার বয়স সবে বার বছর, আরও হয়ত বাষট্টি বছর বাঁচতে হবে। সেই

জীবনের প্রস্তুতি শেষ করে নাও। তোমার সাইকেল কেনবার টাকা ফাদার থমাসের কাছে জমা রইবে, এণ্ড এট্‌ ফিফ্‌টিন ইউ গেট্‌ ইট্‌।

মনে মনে হিসাব করে দেখলাম আরও তিনবছর বাকি। তিন বছরের হিসাব অসহ্য। তিন দিনই তো দীর্ঘদিন। মায়ের কথার জবাব দিতে পারলাম না। মায়ের মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম, এই প্রতিশ্রুতির কোন নড়চড় হবার আশা নেই। মা-ও চুপ করে বসে রইলেন। আচমকা বলে ফেললুম, তোমার সাথে আমিও যাব!

আতকে উঠলেন জর্জির মা নাজমা বেগম। সারা মুখে খড়ির আঁচড় কে যেন টেনে দিল। সহজেই সামলে নিলেন, বললেন; আমারও সেই ইচ্ছে ছিল। তবে এখন তা হবার নয়। পাঠ্যজীবন শেষ করে নাও, তারপর। মাই সন্‌, আমার সব কিছুই তোমার জন্য মজুত থাকবে। সব পাবে, পাবেনা শুধু এই জীবনটা৷ এই জীবনই হল ভবিষ্যতের মান-দণ্ড। এখান থেকেই জীবনের পাঠ আরম্ভ হবে, তারপর পাবে অফুরন্ত সময়, মানুষ হবার পথে বিঘ্ন যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখাই বাবা মায়ের নৈতিক কর্তব্য। সে কর্তব্য থেকে আমাকে বিচ্যুত হতে দিওনা। তোমাব মঙ্গল তুমি স্থির করে নাও।

সে বয়সে মায়ের ঐ উপদেশ সবটা বুঝতে পারিনি। যেটুকু বুঝে ছিলাম তা মোটেই সুখকর মনে হয়নি। আজও ভেবে দেখি মায়েব স্নেহেব চেয়ে নৈতিক কর্তব্য মোটেই বড় নয়। অথচ সেদিন তা মেনে নিতে হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর মায়ের হাত ধরে বাজারে গেলাম। যেখানে গেলাম সেখানেই ভীড় জমে উঠেছিল। সবাই কাড়াকাড়ি করে এগিয়ে আসছিল আমার মাকে দেখতে। কেন, তা জানতুম না। যারা কাড়াকাড়ি করছিল তাদের সাথে পরিচয় থাকলে জেনে নিতুম কেন তাদের এত আগ্রহ। তবে সবাইয়ের মুখেই শুনেছিলাম, নাজমা বেগম, কণ্ঠ আর রূপ অনবদ্য। দেখবার মত বস্তু।

ফুরিয়ে গেল সুখের দিন। বিকেলবেলায় গাড়িতে করে মায়ের সাথে ফিরে এলাম মিশনে। পুরাতন জীবনের বাধা নিষেধের কথা ভেবে শিউরে উঠলাম। ফাদার বেরি সোজা পাঠিয়ে দিল আমার রুমে। আমি বার বার ফিরে দেখছিলুম মাকে, মা-ও রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলেন। দোতালার বারান্দায় রেলিং হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম সন্ধ্যার আধা আঁধারে ফাদার থমাসের অফিস থেকে বেরিয়ে

গেলেন আমার মা। আমার মা নাজমা বেগম। আমাকে ওরা কেউ দেখতে পায়নি, আমি-ই দেখেছিলাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি, সে কাঁদার রেশ রোধ করতে পরপর কটা দিন পেরিয়ে গিয়েছিল। রাতের বেলায় খাবারের ঘণ্টা শুনেও বিছানা থেকে উঠতে পারিনি, কেঁদে কেঁদে বালিশ ভেজালাম সারারাত। মায়ের সাহচর্য্যের সুখ স্মৃতি ভুলতে পারিনি কিছুতেই।

থামল জর্জি ফ্রাংকাইন। সিগারেট কেস খুলে ধরল, বলল, হ্যাভ্ এ স্মোক। লাইটার জ্বেলে দিল সে নিজেই। এক মনে সিগারেট টানছিলাম, মাঝে মাঝে নীরবে বসে তার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ বলে উঠল, নাথিং ইণ্টারেসটিং, অল বাবিশ। শুনতে তোমার বোধহয় ভাল লাগছে না।

গম্ভীরভাবে বললাম, কে বলল ?

দৃঢ়ভাবে জর্জি বলল, আমি বলছি। আমার এসব কথা শ্রুতিযোগ্য নয়। নোংরা, অতি ডার্টি। তবুও মনের দুঃখে এসব না বলে পারছিনা। অনেকদিন চেপে রেখেছিলুম। আই রিকোয়ার কন্‌ফেসান্, চাই অনুশোচনা। লর্ড সেইড্ সো। আমার পাপের স্বীকৃতি দিয়ে অনুশোচনা করতে চাই। মায়ের কাছেই শিখেছিলুম, সহনশীল হও, অনুশোচনা কর, পাপ থেকে দূরে থাক। সে সব কথা হল কথার কথা, তিনি বলতেন ফলো মাই ওয়ার্ডস, নট্ মাই ডিড্। আমার কথা শোন, আমার কাজ কোরো না। মিশনের ফাদাররা বলত আর বেথেলহামের শিশু বলত, আমাকে অনুসরণ কর। মনে হয়, এই দুটোই তালগোল পাকিয়ে আমার সামনে অমানুষ হবার পথ খুলে দিয়েছিল। মাকে বলেছিলুম, মা উত্তর দেননি। কেন জানিনা, সেই যে আমাকে হোষ্টেলে রেখে মা চলে গেলেন তারপর আরও আটটা বছর তিনিও কোন পত্র দেননি আমাকে। আমিও দেইনি।

বয়স বিশ বছর পেরিয়েছে। বিশ বছরের যুবকের যে চঞ্চলতা তা মোটেই দেখা দেয়নি। ছোটবেলায় মিশনে যে সব মেয়ে আমার সাথে একই ক্লাশে পড়ত তারা বড় হয়ে মিশন ছেড়ে বাইরের স্কুলে পড়তে গেছে. ফাদার থমাস মিশন কম্পাউণ্ডে বার বছরের বেশী বয়সের মেয়েদের আসতে দিতনা।

বাল্যের সহপাঠিনী ছিল গুণবতী পিটার। শহরের উপকণ্ঠ থেকে পড়তে আসত মিশনে। তাকে ভুলেই গিয়েছিলুম।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। পড়াশোনার তাগাদা নেই। বিকেলে খেলাধুলা করতাম, সকালে স্টাডিতে পড়াশুনা করতাম। হোষ্টেলে সহপাঠীদের সংখ্যা প্রায় কমে গেছে। তিনজন ছিলুম, আমার মত অপর দুজনের হোষ্টেলে থাকবার কোন বাধ্যবাধকতা ছিলনা। ওরা যাব যাচ্ছি করে থেকে গিয়েছিল। বিশেষ করে রেলি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

এই কর্মহীন দিনে রঙীন চিঠি পেলাম গুণবতী পিটারের। নেমতন্ন-পত্র, তার বিয়ে। আমাদের তিনজনকেই নেমতন্ন করছিল সে। শহরের কোন গির্জায় বিয়ে হবে, অবশ্য ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল হোটেলে।

ম্যাথুস বলল, যাবি নাকি জর্জি ?

ছুটি পাব কি ? বিষণ্ণভাবে বললাম।

দুচার ঘণ্টার ছুটি দরকার হয় না। দারোয়ানকে টু পাইস দিলেই গেট খোলা পাবি। তুই রেডি থাকিস। কিছু প্রেজেণ্টেসান্ চাইতো।

চাইলেতো হল না। টাকা কোথায় ? তোমাদের তো টাকা থাকে নিজের কাছে, আমার একটি পয়সা দরকার হলে হাত পাততে হবে ফাদার থমাসের কাছে। কোনদিন টাকাতো চাইনি, হঠাৎ চাইলে সন্দেহ হবে তার।

রেলি বলল, আই উইল্ ম্যানেজ্, ঘাবরাও মাৎ।

রাতের বেলায় ফাদার থমাস হোষ্টেলে রাউণ্ড দিয়ে ঘরে ঢুকতেই ঘড়িতে দেখলাম আটটা। রেলি-ম্যাথুসকে সঙ্গে নিয়ে চুপি চুপি বের হলাম হোষ্টেল থেকে। এই আমার জীবনের দ্বিতীয়বার বাইরের পৃথিবীর সাথে পরিচয়।

রাস্তাঘাট ম্যাথুস চিনত। সহজেই বিয়ে বাড়িতে এলাম। দরজায় অভ্যর্থনা জানাল গুণবতীর বাবা, সেখান থেকে আমাদের হোটেলে পৌছুবার ব্যবস্থাও করে দিল।

সাজানো হয়েছে হোটেলের একখানা হলঘর। মাঝে দাঁড়িয়ে একজন সুসজ্জিতা মহিলা সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। আমাদের প্রবেশ করতে দেখে অভ্যর্থনা জানাল সে। চেনা চেনা মনে হল তাকে। অবাক হয়ে তার

মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি দেখে সে হেসে বলল, চিনতে পারছ না জর্জি, আমি গুণবতী। চিৎকার করে ডাকল, নরসিন্‌হা। ডাক শুনে এগিয়ে এল একজন যুবক, ভদ্র তার বেশভূষা, ঠোঁটে তার হাসি। সে আসতেই গুনবতী বলল, মাই হ্যাজবেণ্ড। কিন্তু নেভার হি বেগুস্‌।

হো-হো করে হেসে উঠলাম আমরা সবাই।

আর ইনি জর্জি উনি রেলি; আর এই যে রোগা বন্ধুটি, ইনি হলেন স্বয়ং ম্যাথুস। ছোটবেলায় একসাথে পড়তাম। তারপর সাতআট বছর দেখা হয়নি। সহপাঠীদের নেমতন্ন করব ঠিক করে মিশন থেকে সবার ঠিকানা চেয়ে পাঠিয়ে মাত্র এই তিনজনকে পেয়েছি।

ধন্যবাদ। খুব দয়া। বলতে বলতে নরসিন্‌হা এগিয়ে গেল আরেক দল অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে।

তোমাকে আমি চিনতেই পারিনি গুণবতী! সেই ছোটবেলায় বার তের বছরের ফ্রকপরা মেয়েকে দেখেছিলুম, আর আজ। লজ্জায় আর বলতে পারলুম না, থেমে গেলাম। সাথে সাথে হেসে উঠল গুণবতী।

আমি ঠিক চিনেছি। না চিনে উপায় আছে। ঐ রেলি-ই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। দুঃখ হচ্ছে রেলি? আবার হেসে উঠল গুণবতী। রেলির মুখ চোখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। রেলি দমবার পাত্র নয়, হেসে বলল, এখন আমার রাইভ্যালরির সময়, কিন্তু আমি মোটেই জেলাস্‌ নই।

সৌভাগ্য। আমি ঠিক করছিলাম তিনজনের কোন জন। তাও আট বছর ধরে ভেবেছিলাম, জর্জি আমাকে অঙ্ক কষাতো, সেই শ্রেষ্ঠ, আবার ভেবেছিলাম, রেলি আমার কান মলে দিত, সেই শ্রেষ্ঠ; অবশেষে ভেবেছিলাম, ম্যাথুস মেয়েদের মত আমার সাথে ঝগড়া করত, সেই ভাল। ডিসিশ্যান হলনা, তাই রাগ করে নরসিনহামের গলায় মালা দিয়ে ফেললুম।

হেসে উঠলাম সবাই। গুণবতী হাত ধরে টানতে টানতে খাবার টেবিলে বসিয়ে দিল।

আনন্দ আর হুল্লোরে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে মাঝরাতে চোরের মতো চুপিচুপি হোস্টেলে ফিরে এলাম। বিছনায় শুয়ে শুয়ে গুণবতীর বিয়ের

কথা ভাবছিলাম। সুন্দর ও নতুন জীবনের কল্পনায় গুণবতী যেন হাসির ঝরণা, আনন্দের ফোয়ারা। এ জীবন যে আমাদের জন্যও সঞ্চিত আছে সে ইঙ্গিতও জেনে এসেছি আজই। মনের সাথে দেহটাও ছুটে যেতে চাইলো এই চার দেওয়ালের বাইরে।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সটান গেলাম ফাদার বেরির কাছে। বিনা ভণিতায় বললাম, আমি দেশ ভ্রমণে যাব।

বেরি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। ফাদার থমাসের ওপরই মতামত দেবার দায়িত্ব তুলে দেবার ইচ্ছে ছিল তার। হয়ত নিজের পদের মর্যাদা রাখতে বলল, নো সাচ্ ইন্‌স্ট্রাক্‌সান ফ্রম্ ইওর মাদার।

ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বললাম গত আটবছরে মায়ের চেহারাও দেখিনি, কোন সংবাদ পাইনি, টু মি, মাদার ইজ্ ডেড। এবাদেও আমাকে জেলখানায় রাখবার নির্দেশ নিশ্চয়ই আপনাকে তিনি দেননি।

বেরি কেমন হকচকিয়ে গেল। প্রতিবাদের সুরে বলল, এই পবিত্র মিশনকে তুমি জেলখানা মনে কর!

আংশিক। আমি দুঃখিত, আমার ইচ্ছা এবং মতামতকে আপনারা কোনই মূল্য দেন না। দেবার কোন আগ্রহও নেই। আমার কি ব্যথা তা আপনি কি বুঝবেন। বিগত আট বছরে মাকে দেখিনি, তাকে দেখতে ইচ্ছা হওয়া কি অন্যায়। না দেখবার বেদনা বুঝবার হৃদয় আপনার নেই। ক্ষমা করুন, আমাকে এই চার দেওয়ালের বদ্ধ বাতাস থেকে কয়েকটা দিনের জন্য মুক্তি দিন নইলে আমি পাগল হয়ে যাব। শুধু একটু দয়া। আই উইল্, আই উইল্ গো আউট্। বলা শেষ করে উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই ছুটে বেরিয়ে গেলাম। সেই সময় আমার মনে অবস্থা কি ছিল তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। দুঃখ কখনও অশ্রুধারায় ব্যক্ত হয়, কখনও হয় ক্রোধে। আমি ক্রোধকেই প্রাধান্য দিয়েছিলাম।

অনেক রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ফাদার থমাস ডেকে নিয়ে গেল তার ঘরে। চেয়ার টেনে বসতে দিল, বলল, তোমার কাছে এটা আশা করিনি জর্জি। মিশনের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র তুমি। ফাইন্যাল দিয়েছ, এবার গৌরবটুকু তোমার অপেক্ষা করছে। তোমার মা চান, তুমি এই মিশন থেকে মানুষ হয়ে বের হবে। তারপর সোজা চলে যাবে রোমে, সেখান থেকে ল'পড়ে

আসবে। তোমার মা-ও চান মানুষের মত মানুষ করতে, আমরাও চাই মানুষ হয়ে তুমি আমাদের গৌরব বৃদ্ধি কর। নইলে তোমাকে আটকে রাখবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই।

ফাদার থমাসের মোলায়েম কণ্ঠস্বরে আমার সব উষ্মা জল হয়ে গেল। শুধু অনুযোগের স্বরে আবেদন জানালাম, আমি মাকে দেখব। আমি তার কাছে যাব।

ফাদার ইতস্তত করে বলল, তিনি তা পছন্দ করেন না।

কেন! বলেই কেঁদে ফেললাম।

ব্যথিত কণ্ঠে ফাদার থমাস বলল, এর জবাব আমি দিতে পারব না। যদি তোমার মা কখনও আসেন তাকেই জিজ্ঞেস কর।

আশ্চর্য!

পৃথিবীতে অনেক কিছুই আশ্চর্য মনে হবে। অযথা মন্তব্য করে নিজেকে ছোট হবার সুযোগ সৃষ্টি কর না। পৃথিবীতে সব মা-ই সন্তানকে বুকে তুলে নিতে চান। যখন তার ব্যতিক্রম ঘটে তখন ধীমানরা নিশ্চয়ই বোঝে, এর পেছনে এমন কোন যুক্তি আছে যা সবাইকে বলাও সম্ভব নয়।

বললাম, য়-ফুল। তবুও আমি মাকে দেখব, তার সাথে দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিন।

বেশ আমি তাকে চিঠি দিচ্ছি। তুমি অস্থির হোয়োনা। আত্মাকে কষ্ট দিওনা। আত্মাই পরমাত্মার প্রতীক। আত্মার কষ্ট জীবজগতের কষ্ট। যাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও। সন্তানেব ডাক শুনলে মা নিশ্চয়ই আসবেন।

আর কোন প্রশ্ন কববাব নিবেদন জানাবার অবসর না দিয়ে ফাদার থমাস বেরিয়ে গেল ঘব থেকে। আমিও উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারুণ্যেব জোয়ার এসেছে দেহে আর মনে; বিঘ্নকে ভেঙ্গে এগিয়ে চলাই হল সেদিনের ধর্ম। এই জাগ্রত যৌবনের সূচনায় নিজের মনেই প্রশ্ন জাগল, মায়ের কোল থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার কারন কি! বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কেটে গেল। সকালের আলো ফুটে উঠতেই ফিরে এলাম নিজেব বিছানায়। ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিতে না দিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আরেক কাপ চা হোক, কেমন? বলেই জর্জি উঠে দাঁড়াল। বাধা

দিয়ে বললাম, বেলা অনেক হয়েছে। স্নান করে খেতে যাব। এখন আর চায়ের দরকার নেই।

জর্জি বলল, বেশ। তবে লাঞ্চটা আমার সাথে এখানে হবে। কদিন ধরে শুকনো খাবার খেয়েছ, আজ শহর থেকে কাঁচা সব্জী এসেছে মুখ বদলে নিতে পারবে।

জাহাজের জানালা দিয়ে কর্মব্যস্ত প্রাচ্যের ভেনিসকে দেখছিলাম। জর্জি সিগারেটে আগুন দিয়ে একগাল ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, হ্যাভ্ এ স্মোক। ভাবছ কেন, এত দামী সিগারেট জাহাজী লোকের কাছেই পাবে। আমিই কি খেতুম, রেলি শিখিয়েছিল, তার কাছেই হাতে খড়ি। আগেইতো বলেছি, রেলি আমার সহপাঠী। পড়াশোনায় বেশ কাঁচা। পরীক্ষার আগে আমার কাছ ছাড়তনা। আমার সাথে বসে বসে পড়ত, আমার সাথেই মিশনের মাঠে খেলত, আর সেই সাথে শোনাত অদ্ভুদ অদ্ভুদ গল্প। যা কল্পনার তা বাস্তব কিসে হয় তার পরামর্শ দিত।

রেলি আমার চেয়ে দু'তিন বছরের বড়। বয়সের গণ্ডী থাকে না সহপাঠীদের। রেলির বয়স বেশি, বৈষয়িক ও দুষ্টবুদ্ধিও বেশী। যৌবনের উন্মাদনা ছিল তার শিরায় উপশিরায়। তার কথাবার্তায় চমকে উঠতাম, খুশী হতাম না। তবুও রেলিকে ছাড়তে পারতাম না। কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। সিনিয়র পরীক্ষা দিয়ে রেলি অপেক্ষা করছিল আমাকে সঙ্গে করে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে।

খেলার মাঠে রেলি ছিল সেরা খেলোয়ার। অর্থ-সম্পদ ছিল তার পিতার। আর তার নিজের ছিল শক্ত সমর্থ দেহ। দেহের যে সৌন্দর্য তা ছিল না তার। সেদিক থেকে গর্ব করবার কারন ছিল আমার। আমার কাছেই সে আসত, পড়াশোনায় সাহায্য পেত, বিনিময়ে সকল সহপাঠীদের কলহে সে আমার পক্ষ নিত। আমিও মনে করতাম, যুক্তি যখন অচল, তখন অযুক্তির ঘুঁষি সচল থাকুক। আমি তো নিরাপদ।

গুণবতীর বিয়ের নেমতন্ন খেয়ে আসবার পরই রেলিও বাঁধাছাঁদা শুরু করল। তার পাঠ্যজীবন এখানেই শেষ, এবার বাড়ি ফিরবার পালা। অপেক্ষা করছিল তার কাকার। সেই অবসরে আমাকেও সাথে নেবার ইচ্ছা বারবার জানাচ্ছিল।

রেলি বলত, মা থাকলে কি আসতুম এই মিশনে। বাবা বে' করলেন।

তখন আর কুপ্পুরে থাকা সম্ভব হলনা। নইলে মাঠে মাঠে বেড়াতুম, খালে মাছ ধরতুম, নারকেল বাগানের ছায়াতে তাস খেলতুম। বাট্ স্টেপ্ মাদার, এ হরার। বাবা বুঝলেন। বয়সটা বেশি তাই দুঃখ বুঝবার ক্ষমতাটাও বেশি। পাঠিয়ে দিলেন মিশনে মানুষ হতে। জিহোবা নোজ মানুষ হতে পেরেছি কিনা। তবে ঠকিনি, ঠকাতে দেইনি, দেবও না। মিশন জীবনের এই তো শেষ, এবার বুঝে নেব নিজের জীবনকে।

ছুটি পেলেই রেলি ছুটত দেশে। মারকাবা থেকে দুশো মাইল দূরে সমুদ্রের কিনারায় কোন অখ্যাত গ্রামে তার ঘর। সেখানে যেত উৎফুল্ল ভাবে, ফিরে আসত মনমরা হয়ে, সঙ্গে আনত নানারকম খাবার। হোষ্টেলে এসেই খাবারের বাক্স খুলে দিত, সহপাঠীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হত।

এই প্রথম দেখলাম সে ছুটি পেয়েও বাড়ির দিকে এগোচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করতেই বলল, তোকে নিয়ে যাব বলে বসে আছি, আর অপেক্ষা করছি একটি পত্রের। পত্র এসেছিল, রেলি আমাকে পড়তে দিল সেখানা। কোন এক মেরী রঙ্গনাথন্ লিখেছে মাঙ্গালোর থেকে। নেমতন্ন করেছে, দেশে ফিরবার পথে দুএকদিন তার বাড়িতে থেকে যেতে। রেলি অবশ্য বুঝিয়ে দিল, বাড়ি মানে মাঙ্গালোর নয়, তার বাড়ি ইথপুরমে। মেরী জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছে দু'একদিনেই।

মেরি কে? জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

রেলি জবাব দেয়নি।

আবার বলেছিলাম, তোমার য়ান্টি।

রেলি হেসেছিল। আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য সহানুভূতির আবেশে বলেছিল, এই বয়সে য়ান্টির চিঠি পেতে কেউ হোষ্টেলে বসে থাকে রে বোকা। ববং কাজিন, এবং দ্যাট্ কাজিন মাষ্ট বি এ ইয়ং, লাভলি এণ্ড সুইট গার্ল। মিশনে পড়া সার্প এণ্ড ট্যালেন্টেড্।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

মৃদু হেসে হেসে রেলি বলল, কি দেখছিস! নতুন কথা মনে হচ্ছে। বোকা, দেখলি না গুণবতীকে। ফ্রকপড়া মেয়ে কদিন পরে নিজের মেয়েকে ফ্রক পড়াবে। বাই রোটেশ্যান এই চলছে দুনিয়াতে। নাথিং রং। তোকেও খুঁজতে হবে। এই জীবনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি চলতে পারে না।

আমার এই জীবনের পথ দেখিয়েছে মাই ফাদার। আমারও চাই এমন একজন যে আমার জন্য কাঁদবে, হাসবে, দুঃখ পাবে।

বোকার মত বললাম, তোমার কথা কিছু বুঝলাম না।

বুঝবে, আরও একটু বড হও, তখন বুঝবে। আমারও মা ছিল। তিনি মারা গেলেন। আমার বয়স তখন পনর ষোল। পরের বছরই বাবা বিয়ে করলেন বিধবা জ্যাকোবাইনকে। নতুন মা আসতেই আমাকে পাঠাল মিশনে। তবে জ্যাকোবাইনকে চিনতুম, সে ছিল সেবিকা। মায়ের অসুখের সময় সে নার্সিং করেছিল। তার অবাধগতি ছিল সর্বত্র। বিছানায় জীর্ণশীর্ণ মা আমার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন, তিনি চার মাস ধরে শয্যাশায়িনী। সবাই ক্লান্ত তাকে পরিচর্যা করতে করতে। যার ফলে জ্যাকোবাইনের উপর নির্ভর করতে হত বেশী। আমি খুব ছোট ছিলাম না নিশ্চয়ই, বুঝতে পেরেছিলাম মায়ের দিন শেষ হয়ে এসেছে। সকাল সন্ধ্যায় বসে থাকতুম মায়ের পায়ের কাছে। শেষের কটা দিন যাতে শান্তিতে কাটে তার চেষ্টায় ছিলুম সবাই। রোজ সকালে ফাদার মুদালিয়র আসত, বাইবেল পড়ে শোনাতো মাকে। ডাক্তারবাবু এসে শলা পরামর্শ করত, নতুন নতুন ওষুধের তালিকা লিখে দিয়ে ফিরে যেত তালুক শহরে। আমি ঘোড়া নিয়ে ছুটতাম ওষুধ সংগ্রহের আশায়। বাড়ির সবাইয়ের মুখোচোখে ছিল আতঙ্কের ছাপ। ব্যস্ততা ছিল সবার অথচ কোথায় যেন ছন্দ কেটে গেছে কারোর, কেননা আসল মানুষটি ছিল শয্যার আশ্রয়ে। সৌরজগতের কেন্দ্রমণি তখন মেঘাচ্ছন্ন প্রায়।

রেলি দম নিয়ে আবার বলেছিল, এমনি করেই দিন কাটছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তেজিতভাবে বলল, এ-পাশের ঘরে যখন আমার মায়ের নাভিশ্বাস উপস্থিত, গড্ ফরগিভ্ মি, তখন ও-পাশের ঘরে আমারই বাবা মশগুল জ্যাকোবাইনকে নিয়ে। আই, আই কাউণ্ড্ হিম্ মোষ্ট্ ইনডিসেণ্ট্‌লি। রাগে দুঃখে মায়ের কাছে ছুটে এসে চুপি চুপি বললাম। মা নীরবে শুনলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, ভগবান ওদের মঙ্গল করুন। এণ্ড সি ডায়েড। দে কিল্‌ড্ হার।

রাগে গর্‌গর্‌ করে রেলি বলেছিল, জ্যাকোবাইন আমার নতুন মা। আইন তাকে অধিকার দিয়েছে, ধর্ম তাকে মর্যাদা দিয়েছে। এই

জ্যাকোবাইনের প্রথম পক্ষের কন্যা মেরী। সি লাইক্‌স্‌ মি, সি লাভস্‌ মি। আমার চেয়ে বয়সে দু-তিন বছরের ছোট-ই হবে। বাট্‌ ভেরি বিউটিফুল্‌। সেই মেরীর নেমতন্ন। যাবি জর্জি। বাট্‌ ডোণ্ট্‌ বি জেলাস্‌।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথায় ?

আমার বাড়ীতে কুপ্‌পুরে।

ফাদারের হুকুম চাই, বিষণ্ণভাবে বললাম।

তার ব্যবস্থা আমি করব। পরীক্ষার ফল বের হতে অনেক দেরী। ততদিন আমার বাড়ীতে বেশ কাটিয়ে আসতে পারবে। ছুটিটা এন্‌জয় করতে পারবে। যদি ভাল না লাগে ফিরে এস এই বন্দীশালায়।

বললাম তুমি, ফাদারের হুকুমটা নাও। যদি হুকুমটা পাও নিশ্চয়ই যাব। আমিও চাই এই পরিবেশ থেকে কিছুকাল বাইরে থাকতে। যে মায়ের কথা মনেই পড়েনা, সেই মায়ের আদেশে বন্দী থাকতে হবে চিরটা কাল এ অসহ্য! আমিও ছাড়িনি। গত আটটা বছরে একটা চিঠিও দেইনি তাকে। মাঝে মাঝে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে হয়েছে। কখনও ভেবেছি, আমি হয়ত পাগল হয়ে যাব। তারপর চেষ্টা করেছি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে। নইলে কি হত কে জানে।

বেলি মাত্র পাঁচটি দিন সময় চেয়ে নিল আমার কাছে। যেতে যেতে বলল, সামথিং ডেভিল।

কোন উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসলাম। বিগত জীবনটাকে উল্টেপাল্টে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। সব কিছুর মাঝে গুণবতীর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। কল্পনায় মেরী আর বেলির পূর্বরাগের চিহ্নগুলো খুঁজে দেখছিলাম।

পাঁচদিন গত তখনও হয়নি। চতুর্থ দিনেই ফাদার থমাসের আদেশ-পত্র নিয়ে বেলি হাজির হল আমার ঘরে। কাগজখানা মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, এই নাও পারমিট।

বিস্মিতভাবে চোখ বুলিয়ে নিলাম কাগজখানায়। উৎসাহের সাথে বললাম, তুমি নেপোলিয়ন। অসম্ভবকে সম্ভব করেছ দেখছি। আমি ভাবতেও পারছিনা, কি করে তুমি এটা সম্ভব করলে।

করেছি একটি সর্তে। তোমাকে কুপ্‌পুর ভিন্ন অন্য কোথাও যেতে দিতে

পারব না। বুঝলে বন্ধু। আমি তো জানি, শেকল খুললে পাখি কখনও নির্দ্দিষ্ট স্থানেই থাকে না, উড়ে বেড়ায়। বলেই রেলি হো-হো করে হেসে উঠল।

সারাদিন প্রস্তুতি চলল। কোথায় কৃপ্‌পুর তাও জানিনা। রেলি বলেছে মোটরে, রেলগাড়িতে, নৌকায় আর গরুর গাড়িতে যেতে হবে। আমার আর সাজসজ্জার প্রয়োজন ছিল না। যেতে পারলেই বাঁচি, এবং যত তাড়াতাড়ি এই বন্ধস্থান ত্যাগ করতে পারি ততই সুখের।

বিছানাটা সাথে নেবার ইচ্ছে ছিল। বাধা দিয়ে রেলি বলল, তুমি তা গো-ভাগাড়ে যাচ্ছ না, যাচ্ছ আমার বাড়িতে। সেখানে নিশ্চয়ই তোমাকে গোয়াল ঘরে থাকতে দেওয়া হবে না। আমার যদি স্থান সংকুলান হয় তোমারও হবে। আমার মাননীয় অতিথি তুমি।

মোটরের পথ পেবিয়ে যখন ট্রেনে উঠলাম তখন বিশ্বাস হল আমি মুক্তির সন্ধান পেয়েছি, সত্যি সত্যি আমি মিশনের চার দেওয়ালের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসতে পেরেছি। এই অকল্পনীয় দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় দিন। রেলি না থাকলে এই দিনটি কোন দিন পেতুম কিনা সন্দেহ। রেলিকে সেজন্যই বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছি।

মায়ের সাথে মোটরে চড়েছি আটবছর আগে। তখন আমার বয়স এগাব অথবা বার। মোটরে চড়বার আগ্রহ থাকলেও উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু ট্রেনে চড়েছি সেই ছয় বছর বয়সে, ভুলেই গেছি রেলগাড়িব কথা। রেলগাড়িব কাঠের বেঞ্চিটা মনে হয়েছিল দিল্লীব ময়ূর সিংহাসনেব মত অপূর্ব বস্তু। একবাব গাড়িতে বসছিলাম, আবাব নেমে গিয়ে ইঞ্জিনটা দেখছিলাম। গাড়ি ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা বাজা মাত্র এসে বসলাম ট্রেনের বেঞ্চিতে। কোন রূপকথার দেশে এসে গেছি। মোটবে রেলিব সাথে বিশেষ কোন কথা হয়নি ট্রেনে উঠেই আনন্দের আতিশয্যে বকে চললাম।

গাড়ি ছাড়বাব সাথে সাথে রেলি পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করল। নিজে একটা নিয়ে আরেকটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

বললাম, অভ্যাস নেই।

রেলি হেসে বলল, আমারও নেই। মেরী যদি জানতে পারে তাহলে আর আস্ত রাখবে না। তবে যাত্রাপথকে আনন্দময় করতে সিগারেট হল বেস্ট্ কম্পানিয়ন্। নে, দুএকটা টান দে। ভাল না লাগলে ফেলে দিস।

অনিচ্ছার সাথে নিলাম একটা। এই হল ধূমপানের হাতে খড়ি। অনেক চেষ্টা করে ধরালাম সিগারেট। টান দিতেই মনে হল সমস্ত স্নায়ু যেন অকর্মণ্য হয়ে গেল। সেই সাথে আরম্ভ হল প্রচণ্ড কাশি। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিলাম জানালা দিয়ে। মনে হল নবজন্ম লাভ করলাম।

রেলি হেসে বলল, হোপ্‌লেস্‌।

আমিও হেসে বললাম, হোপ্‌ফুল হওয়া অত সহজ নয়। তোর মত হতে অনেক দেরী। ফাদার থমাসের কাছ থেকে পারমিট যে আনতে পারে সেতো করিতকর্মা লোক। যাই বলিস তুই না থাকলে কস্মিন কালেও ওটা পেতাম না। ধন্যবাদ।

সিগারেটটা ভাল করে বাগিয়ে ধরে রেলি বলল, ফাদার থমাস পারমিট দেবার ছেলে আর কি। ফাদার বেরি অনুরোধ জানিয়েছিল বলেই পারমিট পেয়েছিস। তাও কি হত। নেহাত বেরিকে চোরের মত থাকতে হয় এণ্ড ফর্ য়্যান্ য়্যাক্সিডেণ্ট্।

উদ্‌গ্রীবভাবে বললাম, মানে!

মানে শুনে কাজ নেই। তোর কাজতো হাসিল হয়েছে। গেট্ ফ্রম মি, ফাদার বেরির সামর্থ্য নেই আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে। এনি হেল্ আই ক্যান্ ডু। দেখতে চাস!

গম্ভীর ভাবে বললাম, দেখতে চাই না।

গাড়ি ছুটছে। আমি জানলা দিয়ে বাইরের জগৎটা দেখছি। রেলি শুনিয়ে চলেছে তার গ্রামের কথা। চুপি চুপি ইসারা ইঙ্গিতে জানাচ্ছিল মেরীর সাথে তার সম্পর্কের কথা। জীবনে সজ্ঞানে এই আমার পথচলা, তার মত আমার দেশও নেই, গ্রামও নেই, সেদিন কোন পরিবেশও ছিল না। রেলি বলছিল কত কথা, সব কথা কানে না এলেও মাঝে মাঝে তারিফ করছিলাম, বোকার মত ছোট ছোট অদ্ভুদ্ প্রশ্ন করছিলাম। আমার অজ্ঞতায় রেলি হেসে উঠেছিল, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বিদ্রূপ মন্তব্যও করছিল। 'বইপড়া বিনা আর কিছুই শিখিসনি। আজতো আর কুপ্‌পুরে পৌঁছাতে পারব না। রাতের বেলায় বিশ্রাম নেব মেরীর

খুড়োর বাড়িতে। সেখানে মেরীর কাছে ট্রেনিং নিয়ে নিস, নইলে সংসারে চলতে হবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।'

গম্ভীরভাবে 'অবশ্যই' বলে চুপ করে বসে রইলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের যাত্রার সাময়িক বিরতি ঘটল। ষ্টেশন থেকে কুলীর মাথায় মালপত্র দিয়ে এলাম নদীর ঘাটে। দুপাশে বাদামের ক্ষেত, তারই মাঝ দিয়ে দো-পায়া রাস্তা নদীর ঘাটেই শেষ।

রেলি নৌকা ভাড়া করল। সমুদ্রের ছোট খাঁড়ি। সেই খাঁড়ি দিয়ে নৌকায় যেতে হবে অনেকটা পথ। হিসাব মত রাত নটা নাগাদ মেরীদের গ্রাম ইথ্‌পুরমে পৌছাব। আগামী কাল সকালে সেখান থেকে আট দশ মাইল গোযানে যেতে হবে, তবেই কুপ্পুর। যাত্রা পথের বিবরণ শুনে খুশী হয়েছিলাম। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থেকে আদিম ব্যবস্থা পর্যন্ত এক যাত্রায় রপ্ত হলে কার না আনন্দ হয়, আমিও আনন্দিত হয়েছিলাম। বাইরের পৃথিবী যে এত সুন্দর তা জানতুম না। বাইরের এই সুন্দর সবণীর সাথে এই আমার প্রথম পরিচয়। সমগ্র পৃথিবীকেই হৃদয় দিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলাম সেইদিন।

সূর্য নারকেল বাগানের ওপাশে মুখ লুকিয়েছে। আমার বিকেলের খাওয়া মিটিয়ে নৌকাতে এসে বসলাম। নদীতে তখন ভাটির টান। মাঝিরা বলল, ভাটির টান থাকলে দেড় দুঘণ্টায় ইথপুরম্ পৌছে যাব। এত অল্প সময়ে ইথপুরম্ পৌছাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না রেলির। আমার কানে কানে বলল, মেরীকে নটার সময় আসতে বলেছি। আগে ভাগে পৌছে গেলে মেরীর সাথে দেখা হবে না।

বাড়িতে দেখা হবে তো!

সেখানে কে অভ্যর্থনা জানাবে। তার চেয়ে মাঝিদের বলি ধীরে চলতে।

রেলি নৌকা ধীরে চালাতে উপদেশ দিলেও মাঝিরা ভাটির টানকে উপেক্ষা করতে পারল না। নৌকার গতি কমবার বা কমাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

রেলির আশঙ্কাই সত্য হল। ঘাটে যখন পৌছালাম তখন অভ্যর্থনা জানাতে কেউ ছিল না ঘাটে। রেলি মন্তব্য করল, সি হ্যাজণ্ট্ কাম। বোধহয় আমার চিঠি পায়নি। চল।

বিষণ্ণ মুখে রেলি নামল নৌকা থেকে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিত হল। কেবলমাত্র কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় বাধা দিল ভীমদর্শন এক ব্যক্তি। কর্কশ স্বরে বলল, মালগুলো আমাকে দিন।

রেলি মুখ উঁচিয়ে বলল, হাসিম।

হাঁ সাব। মিসি বাবা পাঠিয়েছে।

সে কোথায়?

সেও আসছে। আমি তাড়াতাড়ি এসেছি, সে পেছনে পড়েছে।

হাসিমের লণ্ঠনের আলোতে রেলির খুশীভরা মুখখানা একবার দেখে নিলাম। শেষ অবধি যেন তারই জয় হয়েছে। সেই জয়ের গৌরবচিহ্ন তার ঠোঁটের উপর খুশীর আলপনা এঁকে দিল।

হাসিমের হেফাজাতে মালপত্র নিয়ে আমরা পথ ধরলাম। হাসিম নিমিষেই ত্বরিত পদে এগিয়ে গেল। দুপাশে সারি সারি নারকোল গাছ। মাঝ দিয়ে সরু পথ। আধা জ্যোৎস্নায় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে ঐ গাছগুলো। এর ছায়া প্রলম্বিত হয়ে গ্রাম্য নির্জনতাকে আরও গম্ভীর করে তুলেছে। আমরা ধীরে ধীরে চলছিলাম। রেলি মাঝে মাঝে টর্চ জেলে পথ দেখে নিচ্ছিল, আমি ছিলাম তার পেছনে। তার সাদা সার্ট আমায় পথ দেখাচ্ছিল। হাসির শব্দে থমকে দাঁড়ালাম। টর্চের আলোতে স্পষ্ট দেখলাম, আমারই বয়েসী একটি মেয়ে খিল্ খিল করে হাসছে।

রেলিও গম্ভীর ভাবে বলল, এই অন্ধকারে একটা লণ্ঠন নিয়েও তো আসতে পারতে।

কেন? জবাব দিল মেয়েটা। তোমার হাতের টর্চ রয়েছে। আমি জানতুম তা থাকবে। আমার দিকে নজর দিয়ে বলল, ইনি কে?

রেলি হেসে বলল, দুঃখিত। পরিচয় করে দেই। ইনি আমার সহপাঠী বন্ধু জর্জি ফ্রাংকাইন। আর ইনি মেরী, ভেরি স্যুইট্ হার্ট।

মেরি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তোমাকে পেয়ে খুবই খুশী হলাম। আজ আমার বাড়িতে তোমার নেমতন্ন।

আর আমি? বলল রেলি।

আমার হাত ছেড়ে রেলির হাত ধরে মেরী বলল, তোমাকেও নেমতন্ন করতে হবে, ডাকতে হবে!

রেলিও কোন কথা না বলে মেরীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে

তার কপালে চুম্বন দিল। মেরী এর জন্য প্রস্তুতই ছিল, তবুও একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে বলল, তুমি বড়ই দুষ্টু। ভেরি ভেরি নটি।

ইজ্ ইট্, বলে রেলি হো-হো করে হেসে উঠল।

আমার কেমন গোলমাল হয়ে গেল। আট বছর আগে আমার মা আমাকে বুকের সাথে টেনে নিয়ে চুমু খেয়েছে, সেদিন দুষ্টুমির কথা তো কেউ বলেনি। মেরীর কোপপ্রবণ উক্তির মাঝে আরও কিছু লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই। সেদিন কি জানতুম, ওটা কোপ নয়, অভিমান। আর জানতুম না দুষ্টু মানুষটাকে সাদরেই কেন বা ডেকে নিয়ে চলেছে, কিছুই বুঝলাম না।

বয়সের হিসাবে আমার বোঝা উচিত ছিল, অবশ্য আমার জ্ঞান চক্ষু কয়েক দিনেই খুলে দিয়েছিল ওরা দুজনেই। তাই পরবর্তী কোন ঘটনা দেখে আর বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকতে হয়নি।

রেলি জিজ্ঞাসা করল, সময় মতো আমার চিঠি পেয়েছিলে?

নিশ্চয়ই। নইলে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতুম কি? মালপত্র নিয়ে হাসিমকে এগিয়ে যেতে দেখেই নিশ্চিন্ত হলাম। নারকোল বাগানে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিলুম। এত দেরী করলে কেন? পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে অনেক দিন আগে।

ঐ জর্জিটার জন্য। ওকে নিয়ে আসব মনে করেছিলাম। ওকে বাইরে যেতে দেয় না কখনও। ওর মায়ের নিষেধ। স্পেশাল পারমিশ্যান্ নিতে হল। তাও কি পেতুম। ফাদার বেরিকে কব্জায় পেয়েছিলুম একদিন। নইলে সব ভেস্তে যেত। বেচারা ফাদার বেরি। দুপুর বেলায় গিয়েছিলুম তার বাসায়। ডাক শুনে বেরি বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। উঁকি দিয়ে দেখি বাথরুমের কোনায় জরসর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের হোষ্টেলের ঝি পুন্নিয়া।

বলতে বলতে থেমে গেল রেলি।

মেরী কোন কথা না বলে চলতে লাগল।

বাট্ দি মোটিভ্ ওয়াজ নট গুড্। মন্তব্য করল রেলি।

মেরী বাধা দিয়ে বলল, ওসব নোংরা কথা শুনতে চাই না।

বেশ! তাহলে বল, আমার জন্য কি রান্না করেছ!

আমি করিনি। রান্না করেছে খুড়িমা, অবশ্য আমি তাকে সাহায্য করেছি। তার মধ্যে একটা পুডিং আমার তৈরী।

কথা শেষ হতে না হতেই আমাদের পথ শেষ হল।

রেলি মাতব্বরী আরম্ভ করল বাড়ি পৌঁছেই। আমার স্বভাবজাত লাজুকতা কুনো করে রেখেছিল, কিন্তু রেলি এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যাতে ওদের সাথে সহজেই মিশে গেলাম।

খেয়ে উঠে রেলি জিজ্ঞাসা করল, কটা বাজে?

বললাম, এগারটা বেজে গেছে।

চল, এবার বিশ্রাম। সারাদিনের শ্রান্তি বিনোদন।

গ্রাম্য জীবনে রাত এগারটা অনেক রাত। খেয়ে দেয়ে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। রেলির জায়গা আমার পাশেই। দেখতে দেখতে সে পড়ল ঘুমিয়ে। মেয়েরা সংসারের কাজ গুছিয়ে শুয়ে পড়েছে। সারা বাড়িতে নিশুতি নেমে এসেছে। আমার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। চোখ বুঁজে শুয়েছিলাম। চার দেওয়ালের বাইরে এসে কি যে প্রশান্তি লাভ করেছিলাম তা আজ কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সারাটা পথ জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম বাইরে। দেখছিলাম গাছপালা, ছোট ছোট গ্রাম। চাষের জমি। উঁচু নীচু টিলা, রাখালের গরু চড়ানো, আরও কত কি। যে সব দৃশ্য দেখে এসেছিলাম সেগুলোই মনের কোনায় পাক দিয়ে ঘুরছিল। মাঝে মাঝে রেলি আর মেরীর প্রথম সাক্ষাতের ছবিটাও চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, ধীরে ধীরে তার অর্থও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

যারা ঘুমোয় না, রাত জাগে তাদের মনটা ঘুরতে থাকে অনিশ্চিত এবং কাল্পনিক জগতে। সে জগতে আমারও ভ্রমণ যেন বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছিল। তবুও মেরী আর রেলির প্রণয়মাখা দৃষ্টি যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলছিল। তাদের চাহনির তলায় ভবিষ্যতের কত বড় ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল তা আমি সে দিন বুঝতে পারিনি। ঝিমুনির মাঝে মাঝে তাদের ঐ চাহনিকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। রাগ-অনুরাগ অথবা বীতরাগ, সে প্রশ্ন সেদিন মনে জাগেনি। আজ বুঝি ওদের চাহনিতেই ছিল বিশ্বের চিরন্তন সত্যের ইঙ্গিত ও আশ্বাস। আমি যদি তা বিশ্বাস করতে পারতাম সেদিন, তা হলে হয়ত আমাকে আজ জলে ভাসতে হোত না।

কে যেন ডাকল! মনে হল মেরীর গলার শব্দ। আমাকে ঘুমন্ত মনে করে রেলি ধীরে ধীরে উঠে গেল। আমি নীরবে শুয়ে রইলাম।

আমার নিদ্রাপর্ব শেষ। কেমন এক অস্থিরতা অনুভব করতে করতে ঘেমে উঠছিলাম, নাড়ীর গতিও যেন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কোন রকমে চোখ বুজে শুয়েছিলাম।

রেলি যখন ফিরে এসে শয্যায় গা এলিয়ে দিল তখন সকাল হতে আর দেরী নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখির কচকচানি শোনা গেল। ঘুমিয়ে পড়লাম ভোরের হাওয়াতে।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন অনেক বেলা। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি নটা বাজতে আর দেরী নেই। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মেরী। সেই চঞ্চলা হরিণীর মত তার পদক্ষেপ, চটুল সেই চাহনি। ডেকে বলল, জর্জি উঠে পড। স্নান টান কর।

কাল রাতে চুপি চুপি যে মেরী এসে রেলিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এ মেরী যেন সে মেরী নয়। রাতের ঐ অভিসারের সামান্য চিহ্নও কোথাও নেই। তার মুখের দিকে বার দুয়েক ভাল করে চেয়ে দেখলুম। তারপবই কোন বাক্য ব্যয় না করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম।

বারটা না বাজতেই প্রস্তুত হলাম কুপ্পুরের গোযানের সোয়ারী হতে। বেলিও প্রস্তুত। দেরী হচ্ছে দেখে আমিই তাগাদা দিলাম। ঐ তো মেয়েদের দোষ। সাজগোজ করতেই এক ঘণ্টা।

জিজ্ঞাসা কবলাম আর কে যাবে?

কেন, মেরী যাবে।

কোথায়? বোকার মত প্রশ্ন করলাম।

তার মাকে দেখতে আমাদের বাড়িতে।

মেরীকে সঙ্গছাড়া না করবার অজুহাত বেশ আবিষ্কার করেছে। মনে মনে খুশীই হলাম।

মেরীর খুড়ীমা এসে বিদায় জানাল। খুড়ো তখন গেছে পাঠশালায়, সেখানে সে মাষ্টারী করে। যাবার সময় তার সাথে দেখা হল না।

গাড়িতে উঠলাম তিনজনেই। গো-যানে বলদ জুড়ে দিল মেরীদের রাখাল। ধীর মন্থর গতিতে চলতে লাগল গো-যান।

বিকেলে পৌঁছে গেলাম রেলির বাড়িতে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রেলির বাবা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আগ্রহের

সাথে রেলিকে বুকে জাপটে ধরলেন। এই মিলন যে আনন্দের ছাপ দিল বৃদ্ধ পিতার হৃদয়ে তার প্রতিচ্ছবি উঠল ফুটে তার হাসিভরা মুখে।

মেরীকে পেয়েই তার মা এসে চুমু দিল তার কপালে।

অভ্যর্থনার প্রথম পর্ব শেষ হতেই আমি ফিস্ ফিস্ করে রেলির কানের কাছে বললাম, মেরীর মা তোমাকে তো আপ্যায়িত করল না, তোমার বাবাও তো মেরীকে ডাকলেন না। কেন?

রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, বুঝলে।

তবুও ফর্মালি একটা কিছু করা উচিত ছিল।

সেই জন্যইতো নর্ম্যালি মেরীকে বিয়ে করতে চাই। তাহলে, নিদার্ মাই ফাদার নর্ মেরীজ্ মাদার কারও কোন আপশোষ থাকবে না। উই স্যাল্ মেক্ দি ব্রিজ্, অর্ ব্রিজ দি ডিফারেন্স্।

বৃদ্ধ অল্গাপ্পা আর জ্যাকোবাইনকে য়্যান্ ইকোয়াল ম্যাচ্ মনে হল প্রথম দর্শনে। গুণবতী আর নরসিম্হাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে যেমন সুন্দর মনে হয়েছিল, এদের তা মনে হল না। অল্গাপ্পাকে যেন বেশী বৃদ্ধ মনে হয়েছিল, অনুপাতে জ্যাকোবাইনকে যুবতীই বলা যায়।

মেরীর মা কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চেয়েছিল। মেরী সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিল, রেলির সহপাঠী বন্ধু। বেড়াতে এসেছে, থাকবে কদিন।

মেরীর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা ভাল করে দেখলুম। সত্যিকার সৌন্দর্য তার ছিল না। রেলির মুখে শুনেছিলাম, সে শহুরে। শহুরে কায়দায় সৌন্দর্যকে জীবন্ত করবার চেষ্টা তার ছিল। দেহের সৌষ্ঠব তার স্বাস্থ্যে, আর সেই সৌষ্ঠবকে পরিপূর্ণ করেছিল তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভরা টানা টানা দুটো চোখ। ঐ চোখের আকর্ষণী শক্তি অকল্পনীয় এবং অনিবার্য। মুখ তুলে দেখলুম জ্যাকোবাইনকে। মেরীর চোখদুটো কে যেন নিখুত ভাবে তুলে বসিয়ে দিয়েছে জ্যাকোবাইনের মুখে। সে দৃষ্টি যে কি মোহময় তা তুমি না দেখলে অনুমানও করতে পারবে না অমল। মা ও মেয়ের অদ্ভুদ্ সাদৃশ্য। বয়সের তারতম্যে চেহারার কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করেছি কিন্তু পেছন ফিরে দাঁড়ালে কে যে মেরী আর কে যে জ্যাকোবাইন তা বুঝা দুষ্কর। বয়সের পার্থক্য সত্বেও জ্যাকোবাইনকে মেরীর মা বলে মনেই হয় না। মনে হয় দুই বোন। অবাক হয়ে

তুজনের মুখ দেখছিলাম বার বার মুখ ঘুরিয়ে। কেমন যেন ধাঁধা মনে হচ্ছিল।

থামল জর্জি ফ্রাংকাইন।

জাহাজ নিস্তব্ধ, তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল জর্জি।

তিন

খাওয়া শেষ হতেই উঠলাম। জর্জিকে বললাম, আবার দেখা হবে।

ক্ষুন্নভাবে জর্জি বলল, কোন কাজ তো নেই, বসো গল্প করি। তোমার বোধহয় ভাল লাগছে না। নোংরা মানুষের নোংরা জীবন কারই বা ভাল লাগে।

বললাম, আমি শ্রোতা মাত্র। তোমার জীবন নিয়ে তুমি সুখী হওনি। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। আজ অবধি কেউ কি বলতে পারে সে তার জীবন নিয়ে সুখী হয়েছে। কেউ সুখী নয় জর্জি। আর নোংরা?— চলবার পথে কম বেশী কাদা না লেগেছে এমন লোক আজও পৃথিবীতে জন্মায়নি। হয়ত সব কাদার ছাপ পড়ে না। তার জন্যে আপশোষে তুমরে যেতে হবে এমন কথা কোন নীতিশাস্ত্রে আছে বল দেখি।

জর্জি যেন তার সমর্থক পেল, উল্লাসের সাথে বলল, রাইট্ ইউ আর্। তবে মানুষ চেষ্টা করে কাদা থেকে বাঁচতে আর আমি যে স্বেচ্ছায় কাদা মেখেছি সর্বদেহে। তার গ্লানিতে জ্বলে মরছি। বাট্ আই ওয়াজ, ইনোসাণ্ট, দ্যাট্ ডেভিল্ জ্যাকোবাইন শোড্ মি দি ডেভিলস্ পাথ। প্রথম পরিচয়ে তাকে বুঝতে পারিনি। বুঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও ছিল না। মেরী আর রেলি আমার মনে পাপের ছায়া প্রবেশ করিয়েছিল আর জ্যাকোবাইন তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। সো য়ানকাইণ্ড্।

পরদিন খেতে বসে জ্যাকোবাইন জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার দেশ কোথায়?

বলেছিলাম, জানিনা।

বিস্ময়ে যেন ভেঙে পড়ল সে, কৌতুক সম্বরণ করতে না পেরে হেসে বলল, তা হলে তুমি সমগ্র বিশ্বের।

জ্যাকোবাইন অজ্ঞাতে সারা পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়েছিল আমার সম্মুখে। মাই ফ্রেণ্ড অমল, তারপর থেকেই আমি "এ সিটিজেন অব দি ওয়ার্লড।" জ্যাকোবাইন যদি জানত তার ভবিষ্যত বাণী অক্ষর অক্ষরে ফলবে তাহলে আমাকে নিষ্ঠুরের মত বিদায় দিতে পারত না। একই ভেলায় চড়ে দুজনে পাড়ি দিতে পারতাম সারা দুনিয়াতে। অবশ্য এটা আমার কল্পনা। মানুষ সহজে তা পারে না। ভোগের স্পৃহার সাথে থাকে সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন, ভবিষ্যতের চিন্তা, এসব একত্র হয়ে মানুষকে স্থানু করে দেয়। তার কোন ব্যতিক্রম ঘটত না, একথা আজ বিশ্বাস করি।

জ্যাকোবাইনের মন্তব্যের উত্তর দিতে পারিনি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কি করেন?

জানিনা।

তিনি কি জীবিত ?

তাও জানিনা। শুনেছি, আমার জন্মের আগেই তিনি মারা গেছেন।

তোমার অভিভাবক কে ?

মা।

জ্যাকোবাইন আর প্রশ্ন করেনি। নিজের মনেই বলল, এমন সুন্দর যার ছেলে তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়।

ক্রমেই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠলাম। রেলি মেরীকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি একা বসে পুরাতন মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টে সময় কাটাই। তবে রোজ বিকেলে গিয়ে বসতুম সমুদ্রের খাঁড়ির ধারে। সঙ্গে রেলি থাকত মাঝে মাঝে, কোন দিন মেরীও থাকত।

এমনিভাবেই তিন চারদিন কেটে গেল।

সেদিন বিকেলে রেলি গেছে মাছের খোঁজে। বাইরে বের হবে কিনা ভাবছি এমন সময় মেরী এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে জর্জি ?

এইতো সবে চারদিন। মতামত দেওয়া কি সহজ। তবে মন্দ নয়।

মেরী হেসে বলল, শহর থেকে গ্রামে এলে প্রথম প্রথম ভালই লাগে, তারপর 'পালাই পালাই' ডাক ছাড়তে হয়।

মেরীকে বাধা দিয়ে বললাম, আমার কাছে সব সমান। গত তের চৌদ্দ বছর কেটেছে মিশনের হোষ্টেলে, বাইরের পথিবীতে কটা শহর আর গ্রাম আছে তার হিসাব পেয়েছি ভূগোলের পাতায়। আর শহর এবং গ্রাম সে যাই হোক, এই দেখলাম প্রথম। কোথাও একঘেয়েমি বোধ করিনা।

বিস্মিতভাবে মেরী বলল, কোথাও যাওনি কখনও!

হয়ত গেছি কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না। বাইরে যে একটা পৃথিবী আছে তা জানলুম এই প্রথম। এর আগে মিশন ছিল আমার গ্লোব।

মেরী আমার কথায় সহানুভূতিসম্পন্ন হল, আমার পাশে এসে বসল। বলল, মিজারেবল! এমন লোক কখনও দেখিনি। মুসলমানদের মেয়েকেও তুমি হার মানিয়েছ।

বললাম, রেলি কোথায়?

মাছ ধরতে গেছে। যাবে তুমি?

আগ্রহ সহকারে বললাম, চল, আমরা দুজনেই যাই।

আমার ভাল লাগে না। রেলি গোঁয়ার বদরাগী। মাছ নিয়ে লোকের সাথে কাড়াকাড়ি মারামারি করে। তবে ভাল মেছুয়া। ওর খেপ্ নিষ্ফল হয় না। মাছ হাতে না নিয়ে ও ফিরবে না, সে যত রাতই হোক।

সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলাম, গোঁয়ার বদরাগী লোকটার সাথে তোমার ভাবও বেশি। ব্যাপারটা কি?

বিকজ্ উই লাভ আওয়ার সেলভস্। বলতে বলতে মেরীর মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু হিংসা করনা জর্জি। তোমার সাথে আগে দেখা হলে হয়ত তোমাকে ভালবেসে ফেলতুম। জিহোবা ইজ্ ভেরি কাইণ্ড, মিনমিনে লোককে আমার পছন্দ নয়, তাই সে ভুল আমি করিনি। বলেই হো-হো করে হেসে উঠল মেরী। তার হাসির লহরে আমার কান মুখ গরম হয়ে উঠল, ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করলাম।

মেরী কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। খাবার হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল জ্যাকোবাইন। জিজ্ঞাসা করল, এত হাসি কিসের?

ও-তুমি বুঝবে না। শোন মা, জর্জি কফি পছন্দ করে না, ও চা খেতে ভালবাসে।

বাধা দিয়ে বললাম, কে বলল তোমাকে!

আই নো। তুমি উত্তুরে লোক, কফির চেয়ে চায়ে তোমার টান বেশি।

জ্যাকোবাইন মেরীর সাথে গলা মিলিয়ে বলল, উত্তুরে লোকেদের আদপই ঐ রকম। আমাদের গন্‌জালিস্ আর আসমত গিয়েছিল উত্তরে ফিরে এসে কি দেমাক। কফি খেতেই চায় না। আরে বাপু করিসতো খানসামার কাজ। কফি পেলেই যথেষ্ট। তা নয়, বাবুদের চা চাই। তা বেশ। তুমি চা-ই খেয়ো। যা মেরী চায়ের জলটা চাপিয়ে দে। অনিচ্ছার সাথে মেরী উঠে গেল।

জ্যাকোবাইন অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি যেন ভাবল। আমি রইলাম বোকার মতো বসে।

ভাল লাগছে না বুঝি? জিজ্ঞাসা করল জ্যাকোবাইন।

আমি সহসা কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, কষ্ট হলে আমাকে বল। লজ্জা কর না। এটা তোমারই বাড়ি। জ্যাকোবাইনের কণ্ঠস্বরে মমতার ছোঁয়াচ।

জবাব দেবার আগেই হাত ধরে টেনে নিয়ে বসলো টেবিলের সামনে। রেকাবিতে একটা একটা করে পিঠে তুলে দিয়ে স্বাদের প্রশ্ন করতে লাগল। কোনটায় কতটা চিনি, কোনটায় কতটা গোলমরিচ দিয়েছে তার হিসেব বলতে লাগল।

তোমার জন্যই এত মেহনত করে রেঁধেছি এগুলো। আরেকবার রেঁধেছিলুম। সে অনেক পুরানো কথা। জ্যাকোবাইন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি মাথা নীচু করে খেতে থাকি।

জ্যাকোবাইন বোধহয় আমার নীরবতায় অস্থির হয়ে উঠল। সহসা তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। বলল, মেরীর সাথে অতো কথা বলনা। মেরীর খপ্পরে পড়লেই সর্বনাশ। রেলি আর মেরী এনগেজড্।

চমকে উঠলাম। অর্থটা স্পষ্ট, বললাম সেকি!

জাননা বুঝি, মেরী আর রেলির বিয়ে আসছে মাসে।

শুনেছি। আনন্দের কথা।

মেরীর যদি মত বদলে যায় তা হলে মেরীর সর্বনাশ।

কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

আমারও এরকম হয়েছিল। নইলে বলতুম না।

চায়ের কাপ হাতে করে মেরী আসতেই জ্যাকোবাইন থেমে গেল। আমি ভেবে ঠিক করতে পারলাম না জ্যাকোবাইন কি বলতে চায়। জীবনে এই প্রথম সমস্যায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। মেরী সম্পর্কে আমার যে কোথাও কোন দুর্বলতা আছে তা খুঁজে পেলাম না অথচ জ্যাকোবাইনের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। আশ্চর্য!

সন্ধ্যার সময় ফিরে এল রেলি। মস্ত বড় একটা সমুদ্রের তাজা মাছ উঠানে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার আরম্ভ করল। মেরী ছুটল ছুরি কাটারি নিয়ে। রেলি বসল মাছ কাটতে।

মাছ কাটা শেষ করে জয়ের আনন্দ নিয়ে রেলি এসে বসল আমার পাশে। কি অসীম ধৈর্যের সাথে মাছ শিকার করেছে সেই কাহিনী শোনাতে লাগল আমাকে। সেই সাথে বলতে লাগল, অতীতে কবে, কি ভাবে মাছ শিকার করেছে। সমুদ্রের মাছ আর জীবজন্তুর কথা দুচারটে শোনাতে লাগল। আমি হাঁ-না কিছুই না বলে শুনতে থাকি। হঠাৎ সে অধৈর্যের মত বলল, চল বেড়াতে যাই।

বললাম, এই রাতের বেলায়।

রাত! রাত কোথায়। এই সবে সন্ধ্যা। নাও রেডি হও।

অগত্যা চললাম। সাথী হল মেরী। নারকোল বাগান পেরিয়ে এসে বসলাম খাঁড়ির কিনারায়। পাশাপাশি নীচের ঢালুতে বসল মেরী আর রেলি। আমি উচুঁতে বেশ দূরত্ব রেখে বসলাম। রেলি পেছন ফিরে দেখে নিল আমাকে। দূরত্বটা যথেষ্ট বুঝে মেরী অনুযোগের সুরে বলল, য়াম্ নট্ ভার্জিন। আর শুনতে পেলাম না। রেলিও তাকে প্রবোধ দিতে অনেক কিছু বলল। বিবাহটা যাতে শীগ্গীর হয় তার জন্ত মেরী-ই বেশী ব্যস্ত। রেলির ব্যস্ততা কম নয়, বিবাহে সে রাজি, তবে পরীক্ষার ফল বের হলেই ভাল হয়।

রেগে মেরী বলল, তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি।

রেলি মৃদু প্রতিবাদ করল অস্ফুট স্বরে।

কি বললে, নট্ এ মাদার। বেশ! বলেই মেরী উঠে দ্রুতগতিতে নারকোল বাগানের পথ ধরল। রেলিও দু একবার ডাক দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। ছুটল তার পিছু পিছু। আমি নতুন জগতের অধিবাসী, বুঝছি সবই, অথচ তার ব্যাখ্যা করতে পারছি না। নিঝুম হয়ে বসে রইলাম। রেলি

ফিরে এল একাই। হতাশ ভাবে বলল, সে পালিয়েছে, চল বাড়ি যাই। বড়ই অভিমানী আর জেদী। একটা কিছু না করে বসে। তাকেই বড় ভয়।

ফিরে এলাম রেলির বাড়িতে। দরজায় ঘোড়া বাঁধা ছিল। রেলি বলল, বাবাকে কত মানা করি এই বুড়ো বয়সে ঘোড়ায় চেপো না, তা কি উনি শোনেন। এইমাত্র বোধহয় এলেন।

বৈঠকখানায় বসেছিলেন রেলির বাবা। বয়স পঞ্চাশের অনেক উপরে। দেহটা ঈষৎ ন্যুব্জ। মাথার চুলের অধিকাংশই সাদা, বার্ধক্যের পুরো চাপ তার দেহে। আমাদের ডেকে বসালেন পাশে। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই শুরু করলেন নিজের গ্রামের গল্প। গল্প বলতে বলতে ঝিমোতে লাগলেন। রেলি ইসারায় আমাকে ডেকে নিয়ে এল বাইরে। বলল, বাবা এখন আফিম খেয়েছেন। সারারাত বসে বসে ঝিমোবেন। কখনও এসব উপদ্রব ছিলনা। মেরীর মা আমার বাবাকে আফিম খাওয়া শিখিয়েছে। অবশ্য উদ্দেশ্য সাধু নয়। ফাঁকি দিয়ে কিছু সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার ইচ্ছে। এই বার্ধক্যে যদি আফিমে পেয়ে বসে, আশ্চর্য কি। একদিন দেখি সিন্দুকের চাবি জ্যাকোবাইনের আঁচলে। বুঝতে মোটেই বিলম্ব হলনা যে আমার ভবিষ্যত শূন্যে ঝুলছে। স্থির করলাম, জ্যাকো-বাইন, তোমাকেও কদলী প্রদর্শন করব। দাবার একচালে মাত করে দেব তোমাকে। ভাব জমালুম মেরীর সাথে। জ্যাকোবাইনের সব কিছু ঐ মেরী। আমার বিষয়বুদ্ধি টেক্কার তুরুপ। মেরী সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত, এখন জ্যাকোবাইন চিন্তা করছে, কোন শুভ মুহূর্তে আমার গলায় মেরীকে ঝুলিয়ে দেবে। অবশ্য আই অলসো ওয়াণ্ট ছ্যাট্। জ্যাকোবাইনের দুষ্ট-বুদ্ধি নস্যাৎ হবার উপক্রম,

কথাশেষ করে কতকগুল্য অশ্লীল ইঙ্গিত করে রেলি ভেতর বাড়িতে ঢুকল, আমি আমার নির্দিষ্ট ঘরে এসে বসলাম।

রেলি থাকত ভেতর বাড়িতে, আমি থাকতুম বাইরের একটা কামরায়। রাত এগারটা বারটা অবধি দুজনে গল্প করতুম, কখনও কখনও মেরী এসে যোগ দিত আমাদের সাথে, জ্যাকোবাইন মাঝে মাঝে চা দিয়ে আসর গরম করত। সেদিনকার পর্ব শেষ হলেই রেলি চলে যেত ভেতর বাড়িতে, আমি শুয়ে পড়তাম বাইরের ঘরটতে। পাশের ঘরে

আফিমের নেশায় ঝিমোতেন রেলির বাবা। তার কোন সারাশব্দ শোনা যেতনা সারারাত। মাঝরাতে জ্যাকোবাইন যেত রেলির বাবার কাছে। দুধ খাইয়ে ফিরে যেত ভেতর বাড়িতে। যাবার আগে রোজই দুএকটা কথা বলত আমার সাথে।

অলগাপ্পাকে দুধ খাইয়ে জ্যাকোবাইন সোজা এসে দাঁড়াল আমার ঘরের দরজায়। বললাম, শুতে যাচ্ছেন?

জ্যাকোবাইন অন্যমনস্কভাবে বলল, যাচ্ছিলুম, একটা কথা তোমাকে বলব মনে করে দাঁড়িয়ে গেলুম। মেরী আর রেলির বিয়েটা এই মাসেই চাই দিতে, তোমার কি মত?

আমি আনন্দের সঙ্গে বললাম, সেতো ভাল কথা। আর আমার মতেরই বা কি আবশ্যক, ওতো আপনাদের পারিবারিক বিষয়।

কিন্তু কর্তাকে এখনও বলা হয়নি।

আপনি বলতে তো পারেন।

পারি, কিন্তু সে যদি মনে করে আমার স্বার্থে বলছি।

তা করতে পারে। তবে ওরা যখন বিয়ে করবেই তখন আপনার বলতে বাধা কি?

তুমি বলতে পারনা কি?

আমি "পারি কি না" বলবার আগেই জ্যাকোবাইন এসে বসল আমার পাশে। বলল, বুড়ো লোকটা ভাল। মেরীর ভবিষ্যত ভেবেই বিয়ে করেছিলুম ওকে। কবে যে কবরে যাবে কে জানে, তার আগে বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। নইলে ঐ বুড়োকে বিয়ে করতাম কি। আসল হল মেরী। মাহেতে নার্স ছিলুম। মেরীর বাবা ছিল রুগী। সেবা করেছিলুম তাকে, সেই সেবার দান মেরী। তার ভবিষ্যত ভেবেই আবার বিয়ে করেছিলুম এই বুড়োকে।

আমাকে নীরব দেখে জ্যাকোবাইন চাপা গলায় বলল, মেরীকেও সজাগ করে দিয়েছি, সেও গুছিয়ে নিয়েছে মনে হচ্ছে। এবার তুমি প্রোপোজালটা দাও। চার হাত এক হোক, আমি বেঁচে যাই।

বিস্মিত হলাম। রেলি জ্যাকোবাইনকে ঠকাতে মেরীকে চুম্বকের মত টেনেছে, এই হল রেলির মনের কথা। আবার জ্যাকোবাইন বলছে মেরীর ভবিষ্যই ভেবে রেলির স্কন্ধে মেরীকে তুলে দিয়েছে। কোনটা

সত্যি জানিনা। মনে হল দুটোই সত্যি অথচ একপক্ষ অপরপক্ষের মনের কথা জানেনা। যেদিন জানবে?—

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জ্যাকোবাইন জিজ্ঞাসা করল, চুপ করে আছ কেন? উত্তর দাও।

কালকে ভেবে বলব। আপনি শুতে যান।

ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

অনেক রাত হয়েছে কিনা!

রাত অনেক হয়েছে। টেনে টেনে বলল জ্যাকোবাইন! সেই জন্যেইতে এসেছি। রেলি এতক্ষণ হয়ত মেরীর অভিমান ভাঙ্গাচ্ছে। বুড়ো আফিমের নেশায় বিভোর। তাই এত রাতের প্রশ্ন কারও মনে নেই।

আমার হৃদ্‌পিণ্ডর গতি যেন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোনরকমে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে ভগবানের নাম জপ করছিলাম। জ্যাকোবাইন আমার দুর্দ্দশা দেখে কৌতুক অনুভব করছিল। হঠাৎ বলে উঠল, তুমি এত সুন্দর কেন?

ঢোক গিলে বললাম, জানিনা। ভগবান জানেন।

তোমার সৌন্দর্য তুমি দেখতে পাওনা, মেয়েরা পুরুষের সৌন্দর্য বিচার করে, ভগবান নয়। বলেই জ্যাকোবাইন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল। আমি উঠে দরজা বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে ঘামতে লাগলাম।

পরের দিন তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। জ্যাকোবাইনের হাত থেকে মুক্তি চাই, সে মুক্তির পথ মনে করলাম দরজা বন্ধ করে থাকা। মাঝরাতে দরজায় ধাক্কা পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দরজা খুলতেই সামনে দেখি জ্যাকোবাইন দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনের আলোতে তার শক্ত পেশীগুলি দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

জ্যাকোবাইন বিনা ভূমিকায় বলল, তোমাকে ফিরে যেতে হবে জর্জি। এ বাড়িতে তোমার আর থাকা চলবে না। কালকেই যেতে হবে।

এই অপ্রীতিকর আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। জ্যাকোবাইনের কর্কশ কণ্ঠস্বরে ভীত হয়ে পড়লাম, বললাম, বেশ!

বেশ বলেই তো তুমি খালাস। আমার কি অবস্থা হবে ভেবেছ?

বোকার মত বললাম, আপনার অবস্থা সেকি!

হাঁ আমার। কাল অনেক রাতে তোমার ঘর থেকে যখন যাই তখন রাখাল ছোঁড়াটা দেখেছিল। সেই আজ বুড়োকে বলেছে।

জ্যাকোবাইন ফুঁসিয়ে উঠল।

কিন্তু আমরা তো নির্দোষ। আপনি এসেছিলেন মেরীর বিয়ের কথা বলতে।

সমাজ তো শোনেনা। তোমাকে যেতে হবে, আমাকেও নিয়ে যেতে হবে। এ গ্রামে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

কোথায়?

তা তুমি জান! দৃঢ় জ্যাকোবাইনের কণ্ঠস্বর।

জ্যাকোবাইনের মত সুচতুর নারীর কাছে আমি শিশু। জ্যাকোবাইন বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মত আমাকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল দু-তিন দিন। আমিও সুযোগ খুঁজছিলাম পালিয়ে যাবার। একবার ভাবলাম, রেলিকে সব কথা বলি। যদি বলতাম তা হলে অদৃষ্টে এত দুঃখ থাকত না। কিন্তু কেমন অজানা কারনে তা আমি বলতে পারিনি। অনভিজ্ঞতাই মূলতঃ দায়ী এর জন্য।

জ্যাকোবাইনের দুষ্ট বুদ্ধির জয় হল। অচিরেই নিজেকে জ্যাকোবাইনের দুষ্ট ইচ্ছার কাছে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

অবশ্য আজ সন্দেহ হয়, জ্যাকোবাইন আমাকে ভালই বাসতো। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালবাসতো তার স্বার্থকে। স্বার্থ বজায় রাখতে যখন কোন বিঘ্ন দেখা দিল না তখন জ্যাকোবাইন স্বমূর্তি ধারণ করল।

মেরী আর রেলির বিয়ের হাঙ্গামা মিটে যেতেই জ্যাকোবাইন একদিন চুপি চুপি বলল এবার তোমার পালা।

মানে?

এবার সত্যই তোমাকে যেতে হবে।

কেন?

মেরীর ভবিষ্যত ভেবে। যদি কোন দিন মায়ের কলঙ্ক কথা সে জানতে পারে সেদিন আমিও মুখ দেখাতে পারব না, তাকেও গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে। সবার কাছে ছোট হতে পারি, নিজের সন্তানের কাছে ছোট হতে পারি না।

সামান্য কয়েকটি বাক্য দিয়ে জ্যাকোবাইন যেন পৃথিবীর ইতিহাস শুনিয়ে দিল আমাকে। জ্যাকোবাইনের অসঙ্গত জীবন যাত্রার সাথে তুলনা করে দেখলাম তার মাতৃত্ববোধকে। তাকে দোষারোপ করতে

পারলাম না, বরং তার এই আচরণ আমার নিজের মায়ের সম্বন্ধে উদার করেছিল। জ্যাকোবাইনের কপট ভালবাসার মাঝে এইটুকুই আমার লাভ হয়েছিল।

রেলিকে ডেকে বললাম, দুমাস হতে চলল, এবার ফিরে যেতে চাই।

সেই বন্দীশালায় তো।

না। বন্দীজীবন শেষ। ওখানে থেকে পড়বার মত আর ব্যবস্থা নেই সব শেষ হয়েছে। এবার আমাকে যেতে হবে বিলেতে, আইন পড়তে।

রেলি খুশীর প্রাধান্যে বলল, বার্-এট্ ল'। গুড্। কবে যাবি ?

তা জানিনা। ফাদার থমাস ঠিক করবে।

খুব কষ্ট হল তোর, রাগ করিসনা।

মোটেই নয়। খুশী হয়েছি তোকে আর মেরী একসাথে দেখে। বি হ্যাপি।

ফেরবার দিন এগিয়ে এল। ক দিন জ্যাকোবাইনের সাথে একবারও দেখা হয়নি। খাবার সময় মেরী এসে বসত আমাদের সাথে, সেই অনুযোগ অভিযোগ করত। জ্যাকোবাইন সে সময় কোথায় গা ঢাকা দিত তা জানিনা।

অবশেষে গো-যানে উঠে বসতে হল। মেরী চোখ মুছল, দূরে দাঁড়িয়ে রইল জ্যাকোবাইন। তার চোখে বিষাদের ছায়া, কি যেন বলতে চেয়ে বলতে পারছেনা। রেলি আমার সাথেই উঠে বসল গো-যানে। কুপ্পূর পেছনে রেখে গাড়ি চলল ইথ্‌পুরমের দিকে।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, জ্যাকোবাইন সাদা রুমাল উড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছে। তার অব্যক্ত কথা ঐ রুমাল দিয়েই যেন ব্যক্ত হচ্ছে।

ইথ্‌পুরমের ঘাটে নৌকাভাড়া করে রেলি আমাকে নৌকায় উঠিয়ে দিল। কাঁদো কাঁদো ভাবে বিদায় নিল। বলল, মনে রাখিস ভাই। পারিসতো আবার আসিস। আমার তো আর যাওয়া হবে না মিশনে।

নৌকাতে আমি একাই যাত্রী। জোয়ারের টানে নৌকা ছুটছে। বিগত প্রায় দুমাসের প্রতিটি ঘটনা মনের কোনায় উঁকি দিতে লাগল। বিচার করতে পারিনি যে ফেলা আসা জীবনের ক্লেদ চিরকালের জন্য অপেক্ষা করছিল, তা সেদিন ভাবতেও পারিনি।

নৌকা এসে দাঁড়াল ষ্টেশনের ঘাটে। সুটকেশ হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে বুকিং অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মনের অশান্ত অবস্থা যাত্রাপথের স্থিরতা হারিয়ে ফেলল।

টিকিট কিনলাম হায়দ্রাবাদের। ট্রেন আসতেই ছুটে গিয়ে উঠে বসলাম আমার ময়ূর সিংহাসনে, কাঠের বেঞ্চে।

॥ ১ ॥

পাথরের বিরাট দোতালা বাড়ি।

টাঙ্গা এসে দাঁড়াল তার সামনে। ভাড়া মিটিয়ে সুটকেশ হাতে নামল জর্জি ফ্রাংকাইন।

জিজ্ঞাসা করল, বাইশ নম্বর বাড়ি এইটে ?

গেটের সামনে বসেছিল তেলিঙ্গা দারোয়ান। ডানে বাঁয়ে মাথা নেড়ে জানাল, ঐটেই বাইশ নম্বর বাড়ি।

মিসেস ফ্রাংকাইন এখানে থাকেন ?

দারোয়ান ঠিক বুঝতে পারল না তার কথা। সে সহজ ভাবে বলল, ইল্লে।

নেতিবাচক উত্তর শুনে জর্জি চিন্তিত হল। এত পরিশ্রম করে এসে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ভুল করল সে। আট বছর আগে এই ঠিকানায় সে পত্র লিখেছে তার মাকে। সেই পত্র পেয়েই তার মা গিয়েছিল মারকারায়। তা হলে বাড়ি ছেড়ে কোথাও উঠে গেছে! আরেকবার জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, রাঘবন নামে কেউ এখানে থাকে ?

রাঘবন ? হাঁ থাকে।

জর্জি দরিয়ার কিনারা খুঁজে পেল। বলল, তাকেই একবার ডেকে দাও।

সে তো এখন নেই। চকে গেছে বাজার করতে। ঐ পাথরটায় বস, এখুনি সে এসে যাবে। বস ঐ পাথরটায়। হাঁ এখানে।

সামনেই একটা বড় পাথরের টুকরো, তাতেই বসল জর্জি।

বসেই চিন্তায় মুষরে পড়ল। পৃথিবীতে বহু রাঘবন আছে, এ রাঘবন

সেই রাঘবন কিনা সেও তো সন্দেহের বিষয়। যদি তাকে পাওয়া যায় তা হলে মায়ের সংবাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

একবার ভাবল, এটাতো আমারই বাড়ি। জোর করে ঢুকলে কেমন হয়। সামান্য একটু হৈ-চৈ হতে পারে। তাতে লোক জমায়েত হবে, মা-ও এসে যেতে পারেন। পরিচয়টা কোন্দল দিয়ে আরম্ভ হোক্। না দরকার নেই।

বেলা বাড়তে লাগল। খিদেয় ঝিমুনি এসে গেল জর্জির। বাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল সে। ধৈর্যের সীমা তখন পেরিয়ে গেছে। আচমকা নিজেকে সোজা করে টেনে তুলে জর্জি দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, রাঘবন এসেছে কি!

জানি না।

আমি সেই সকাল নটা থেকে বসে আছি। আমার খুব জরুরী দরকার। একবার খবর নেবে ভাই। যদি সে না এসে থাকে তাহলে আবার বিকেলে আসব।

গেট ছাড়ার হুকুম নেই।

আমি গেট পাহারা দিচ্ছি। তুমি ভেতর থেকে বন্ধ করে যাও। দুচার মিনিট বইতো নয়। একটু দয়া করে যাও ভাই। আমি তার দেশের লোক! জরুরী খবর আছে।

অনিচ্ছার সাথে দারোয়ান উঠল। ধীরে ধীরে গেট বন্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। জর্জি সেই উত্তপ্ত রোদ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গেটের সামনে।

সূর্য তখন দক্ষিণে।

দরজা খোলার শব্দে উৎফুল্ল হল জর্জি। হয়ত রাঘবন আসছে।

এল দারোয়ান, বলল, তোমার নাম কি?

জর্জি ফ্রাংকাইন।

ওরে বাপ্স্। ও আবার কি নাম। লিখে দাও কাগজে।

এক টুকরো কাগজ নাম লিখে দিল জর্জি। আবার গেট বন্ধ করে দারোয়ান অদৃশ্য হল। জর্জি যেন ওয়ান্ডার টেলের গল্প কাহিনীর নায়ক। সবই তার কাছে অদ্ভুত এবং কাল্পনিক মনে হচ্ছিল। তবুও আশা নিয়ে সে অপেক্ষা করছিল মায়ের দর্শনলাভের অত্যুগ্র আকাঙ্খায়।

গেট খুলে দাঁড়াল রাঘবন।

জর্জি ভাল করে দেখল তাকে, সেই রাঘবন। আট বছর আগে যে রাঘবন তাকে নিয়ে বেড়াতে যেত, এ সেই রাঘবন, কোথাও কোন পরিবর্তন হয়নি। জর্জি খুশী মনে বলল, আমি এসেছি রাঘবন।

রাঘবন কুণ্ঠিত ভাবে তাকে ডেকে নিল ভেতরে। বলল, খবর না দিয়ে এসেছ তাই কি হাঙ্গামা বল দেখি। একটা খবর তো দিতে হয়। ষ্টেশনে আমি থাকতুম, গাড়ি থাকত। নিজের বাড়িতে এসে যদি নিজেকে পরিচয় দিতে হয়। ছিঃ, কি লজ্জার কথা। বেগম শুনলে খুবই দুঃখ পাবেন। এই তেলিঙ্গাটার খুপড়িতে একটু ঘেলুও নেই।

জর্জি ভেতরে এসেই জিজ্ঞাসা করল, মা?

রাঘবন ইতস্তত করে বলল, বেগম বোম্বে গেছেন। আগামীকাল আসবার কথা!

মিইয়ে গেল জর্জি। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে, হঠাৎ হাজির হয়ে মাকে কিভাবে তাক্ লাগিয়ে দেবে। কি ভাবে অভিমান জানাবে, কি করে মায়ের স্নেহ নিংরে নেবে, এইসব প্ল্যান ভেস্তে গেল মায়ের অনুপস্থিতি জানতে পেরে।

জর্জি ভেবেছিল, আট বছর আগের দেখা জর্জিকে সে হয়ত চিনতে পারবে না। মিটি মিটি হেসে জর্জি তার পরিচয় দেবে। বলবে সেই হোটেলে কি ভাবে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে অভিমান জানিয়েছে। সব ভেস্তে গেল। জর্জি সামনের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ কথা বলবার মত অবস্থা ছিল না তার।

সম্বিত ফিরে পেয়ে জর্জি তাকিয়ে দেখল ঘরখানা। সামনেই খাট, খাটের উপর তিন চার বছরের শিশুর একটা ফটো দাঁড় করানো রয়েছে! ঘর সাজানো রয়েছে মূল্যবান আসবাবে। এমন সুন্দর সজ্জিত গৃহ ব্যবস্থা জর্জি কখনও দেখেনি। তার জীবনে মেরীর খুড়োর বাড়ি দেখেছে। সামান্য স্কুল মাষ্টারের গৃহে সাজসজ্জার অপ্রতুলতা স্বাভাবিক, অথচ গ্রামের অর্থবান ব্যক্তি অলগাপ্পার গৃহে এই গৃহের তুলনায় সাজ-সজ্জা কিছুই ছিল না। মনে হয়েছিল রেলি বোধহয় অর্থবান, কিন্তু কত অর্থ থাকলে এই রকম গৃহসজ্জা থাকতে পারে তা সে চিন্তা করে পেল না।

কার ঐ ফটো! জর্জি বারবার তাকিয়ে দেখেও চিনতে পারলনা।

ঘুরে ঘুরে সব সাজসজ্জা আসবাবে হাত দিয়ে সে পরখ করতে থাকে। পেছন থেকে ডাক এল, স্নান করে নিন।

জর্জি ফিরে তাকাল।

গৌরবরণ এক যুবতী তাকে স্নান করবার নির্দেশ দিচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়েই মাথা নীচু করল জর্জি। বলল, রাঘবন কোথায়?

কাজ করছে। আপনি স্নান করুন।

জর্জি মৃদু স্বরে বলল, আপনি কে?

যুবতী হেসে বলল, আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কে?

আমি! আমি জর্জি ফ্রাংকাইন। বেগম নাজমা ফ্রাংকাইন আমার মা।

যুবতী হঠাৎ বিব্রত হয়ে উঠল। এ বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসে, তাদের পরিচয় জানবার দরকার হয় না। আজ পরিচয় জানতে চেয়ে যুবতী থমকে গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলল, আমি এ বাড়ির দাসী।

দাসী! এমন সুন্দর যার পোষাক, এমন সুন্দর যার কণ্ঠস্বর সে কখনই দাসী হতে পারে না। মেরীকে সে সুন্দর মনে করেনি, কিন্তু সুন্দর মনে হয়েছে এই যুবতীকে। জর্জি যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। যুবতীর বুঝতে অসুবিধে হল না যে জর্জি ধাঁধায় পড়েছে সে আবার বলল, আমার নাম জিজা। জিজা বলেই ডাকবেন। এখন স্নান করুন, খেয়ে নিন। যখন কোন প্রয়োজন হবে আমাকে ডাকবেন।

জিজা কথা শেষ করে বেরিয়ে যেতেই রাঘবন এসে তাগাদা দিল স্নানের। আহার্য প্রস্তুত।

বিকেল বেলায় জর্জি বসে বসে মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিল। রাঘবন আসতেই জিজ্ঞাসা করল, এ বাড়ি কার?

তোমার অর্থাৎ তোমার মায়ের। এ বাড়ির কথা তোমার মনে নেই?

না তো।

বারে, এই বাড়ি থেকেই তো তুমি মিশনে গিয়েছিলে। সে আজ প্রায় চৌদ্দ পনের বছরের কথা। হয়ত ভুলে গেছ।

ভুলে গেছি। বোধহয় তাই। জর্জি উঠে ঘরের দরজা জানালা পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। রাঘবন জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

দেখছি, কোথাও যদি আমার পরিচয় লুকিয়ে থাকে। কাউকে যদি

চিনতে পারি। না সবাই অচেনা হয়ে গেছে। দূরে থাকলে মানুষই ভুলে যায় মানুষকে, আর প্রাণহীন এই গৃহের সাজসজ্জা তো আমাকে ভুলেই যাবে। আচ্ছা রাঘবন, এই বাড়িতে একটা বাগান ছিল না?

আছে তো।

মনে পড়ে, বিকেল বেলায় মায়ের হাত ধরে বাগানে যেতুম। একটা ছোট মেয়ে, আমার চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট, আমার সাথে বোধহয় খেলত। মনে পড়েছে। তবু ঝাপসা ঝাপসা মনে হচ্ছে।

রাঘবন হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, কিছু কিছু ঠিকই মনে পড়েছে। ঐ জিন্নাই তোমার সাথে ছোট বেলায় খেলত। তখন ওর বয়স ছিল তিন চার বছর।

আই সি। কিন্তু ও যে বলল, আমি এ-বাড়ির দাসী।

তাই বুঝি বলেছে। লেখাপড়া শিখে ফাজিল হয়েছে ঐ মেয়ে। বেগম আসলে বলে দেব। দেখবে কেমন বকুনি খাবে।

না, না, না। বলে বাধা দিল জর্জি। ও হয়ত তামাসা করেছে, মাকে বল না রাঘবন। মা হয়তো সত্যিই রাগ করবেন। তার চেয়ে চল আমরা বাগানে বেড়িয়ে আসি।

চল।

খিড়কি খুলে বাগানে জর্জিকে পৌছে দিয়ে রাঘবন নিজের কাজে চলে গেল।

ছোট্ট সাজানো বাগান। জর্জি বসল সিমেন্ট বাঁধানো বেদীতে। নানা জাতের ফুলের গাছ। মাঝে লাল সুরকির পথ, চার পাশে চারটে হেলান দিয়ে বসবার বেঞ্চ। চারি দিকে উঁচু প্রাচীর। জর্জি চারপাশ দেখছিল মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, বাল্যের সামান্য পরিচয় যদি কোথাও থেকে থাকে সেটুকু সে খুঁজে বের করবেই। স্মৃতির দুয়ারে তার চিন্তা আঘাত পেয়ে ঘুরে আসতে থাকে, কোন কথাই তার মনে পড়ে না। সেদিন কি ছিল এমনি সাজানো বাগান, সেদিন কি এমন সুন্দরভাবে ফুল ফুটত গাছে গাছে। জর্জি চিন্তা করে শেষ করতে পারে না।

সন্ধ্যা নেমে আসছিল। বাদাম গাছের ডালে দোয়েল বসে পাখা দোলাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখ পড়ল দোতালার ঝুল বারান্দায়। জিন্না দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। চোখে চোখ পড়তেই সে ছুটে চলে গেল ঘরের ভেতর। জর্জি অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল।

কি যেন একটা ব্যথা, যার অনুভূতি আছে অথচ প্রকাশ নাই! জর্জি বেদনায় ভেঙ্গে পড়ল। অনুশোচনার দহন শুরু হয়েছে। জ্যাকোবাইনের ছবি ভেসে উঠল

তার মনে। জ্যাকোবাইন প্রশংসা করেছে জর্জির রূপের, দেহের। মেরীও করেছে
প্রশংসা। ওরা মেয়েদের চোখ দিয়ে পুরুষকে দেখেছে। পুরুষের সৌন্দর্য ওদে
কাছে চুম্বকের আকর্ষণ। আজ উল্টোটা মনে হচ্ছে জর্জির। জিজার মত সুন্দরী ে
যেন কোথাও দেখে নি। কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করল জিজার প্রতি
জ্যাকোবাইনের সাহচর্য তাকে টেনে নিয়ে গেছে পতনের পথে। জ্যাকোবাইন কো
আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। জ্যাকোবাইন ছিল উদগ্র কামনার বিভীষিকা
স্নিগ্ধতা ছিল না, ছিল লালসার লোল জিহ্বা। চেঁছেপুঁছে চেটে নেবার ছিল তা
ঐকান্তিক চেষ্টা। তার লালসার বলি জর্জি নিজেই। সেই তুলনায় এই গৃহে
পরিবেশ অনেক পবিত্র, এই পবিত্রতার অঙ্কে বসে জ্যাকোবাইনকে মনে হল ঘৃণ্য
স্বার্থপর, নীচ। ভাবতে ভাবতে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল, দুহাত দিয়ে কপালে
শিরা চেপে ধরে মাথা নীচু করে বসে রইল সে।

কখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে, সে দিকে লক্ষ্য নেই জর্জির
ধীরে ধীরে উঠে এসে খিড়কির দরজা বন্ধ করে ভেতরে পা দিল। ধীরে এগিয়ে চল
নিজের ঘরের দিকে।

ডাক শুনলো, জর্জি।

জর্জির চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। মুখ তুলে দেখল দাঁড়িয়ে রয়েছে জিজা।

কিছু বলবে !

জিজা সহজ ভাবেই বলল, রাগ করবে না তো ?

মিথ্যা কথা না বললে রাগ করব কেন ?

আমিতো মিথ্যা কথা বলিনা। দৃঢ়তার সাথে বলল জিজা।

তুমি যে বললে তুমি দাসী। একথা কি ঠিক ?

বেঠিক নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার পজিসান ওটাই। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে
এনেছিলেন বেগম। যত্ন করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কিন্তু দাবীটা কোথা
আছে বলতে পার। হয়ত বাসনমাজা দাসী আমি নই তবে তাদের হেড্ বলতে
পার। অল্ দি সেম্।

জর্জি অনিমেষ নয়নে জিজার দিকে চেয়ে থেকে বলল, নট দি সেম্।

জোর দিয়ে জিজা বলল, সিওরলি। তবে আমার কোন দুঃখ নেই। আমাকে
মানুষ করেছেন বেগম। আমাকে বড় করবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। ভাগ্যদোষে
সবটা পূর্ণ হয় নি।

বাচাল মেয়েটার সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় জর্জি। এগিয়ে চলল নিজের
ঘরের দিকে।

আঙ্গবুড়ি তোমাকে ডাকছে, বলল জিজ্জা।

কে আঙ্গবুড়ি ?

ছোট বেলায় যার কোলে চড়ে বেড়াতে।

মনে নেই। ছোট বেলার কথা ভুলেই গেছি।

আমিও তো ভুলে গেছি। তবুও যখন শুনতাম বেগমের ছেলের সাথে আমি খেলতাম তখন কতনা আনন্দ হত। তোমার খাটে তোমার ফটোটা দেখতুম আর ভাবতুম কবে তুমি আসবে। ওমা, সত্যিই তুমি এলে। ভাবলুম, কে না কে। যাকে দেখতে চেয়েছি হাজার হাজার দফায়, সে কি না এই! উস্কোখুস্কো চুল, পাগলের মত দৃষ্টি। তবুও রূপ আছে, নইলে বিশ্বাসই হত না।

জর্জি নিজের ঘরে এসে বসল। কথা বলতে বলতে জিজ্জাও এসে চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

তোমার দেখছি রাগ হয়েছে।

কে বলল ?

নইলে আঙ্গ বুড়ির কথা বললে না কেন!

আঙ্গবুড়ি কেন ডাকছিল ?

সিনেমায় যাবে বলে।

সিনেমা!

ও বাবা, নতুন কথা শুনলে নাকি।

নতুন নয়। সিনেমায় যাবে তো আমার কি।

তোমাকেও নিয়ে যাবে।

না।

কেন!

আমি সিনেমা দেখি না।

অনেক কিছুই তো দেখনা, দরকার হলে দেখ। ছবিতে কথা বলবে গান গাইবে। বেশ লাগবে। যাবে ?

অন্যমনস্কভাবে জর্জি বলল, বেশ।

জিজ্জা হেসে উঠল।

হাসছ কেন ?

বা'রে, কি ছবি, কোথায় যাব, কখন যাব, এসব না জেনেই বললে 'বেশ'। তুমি বুঝি কখনও সিনেমা দেখনি।

না। অতো জানবার দরকারই বা কি। দেখতে হবে, দেখব।

জিজা ছুটল আঙ্গিবুড়িকে খবর দিতে।

জর্জির চিন্তার রাজ্যে জিজা যেন একটা নতুন কাব্য, নতুন সাহিত্য, নতুন জগত

রাতের বেলায় দল বেঁধে বের হল সিনেমা দেখতে।

আঙ্গিবুড়ির হাত ধরে জিজা, তার পেছনে পিটার, শরীফন আর জর্জি। মিছি করে কলহাস্যে নিজেদের মাতিয়ে তুলে চলছে ক'জন।

ছবি দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গেছে জর্জি। তার কাছে মনে হল স্ব দেশের অধিবাসী সে। পাশে যারা বসে আছে তাদের কথা ভুলেই গেছে। হঠা জিজার ধাক্কায় সে যেন সম্বিত ফিরে পেল। জিজা জিজ্ঞাসা করল, ঐ (নায়িকা, ওকে চেন ?

না।

ভাল করে ভেবে দেখ। ভাল কবে তাকিয়ে দেখ।

না। কে বল দেখি ?

মা।

মা ! চমকে উঠল জর্জি।

হাঁ, মা ! জোর দিয়ে বলল জিজা। মায়ের অভিনয় মানুষকে পাগল ক(দেয়। কোন রকমে যদি লোকে জানতে পারে নাজমা রয়েছে ছবিতে সে ছবি ; দেখে কেউ ফিরবে না। মায়ের নামের এতই মোহ।

জিজার কথা জর্জির কানে মোটেই প্রবেশ করছিল না। জর্জি ভাবছিল তার মা অপর পুরুষের বুকে মাথা রেখে প্রেম নিবেদন করছে, এও দেখতে আসতে হয়ে তাকে। জর্জি ক্রমশ ঘেমে উঠতে লাগল। জিজাকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, চ বাড়ি যাই।

কেন ?

ভাল লাগছে না।

এমন সুন্দর ছবি ভাল লাগছে না, এতো অভিনয়।

তবুও অভিনয়কেও ভালভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। চল যাই।

জর্জি উঠে পড়ল।

পেছন পেছন জিজাও বেরিয়ে এল হল থেকে।

বাইরে এসে জর্জি বলল, আমি বাড়ি যাচ্ছি, তুমি বরং ওদের সাথে ছবি দেখ।

না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া উচিত নয়।

জর্জি অন্যমনস্ক ভাবে বলল, আগে কেন বলনি আমার মা এই ছবির নায়িকা '

জিজা গম্ভীর ভাবে বলল, তোমাকে অবাক করে দেব মনে করেই বলিনি।

মায়ের ছবি দেখিয়ে বুঝি আমাকে খুশী করতে চেয়েছিলে।

জিজা বুঝল জর্জির ক্ষোভের কারণ। বিনীত ভাবে বলল, আগে জানলে তোমাকে ডেকে আনতাম না। তবে অভিনয় মানুষের আসল পরিচয় নয়। অভিনয় মানুষের শিল্প প্রতিভা। এতে ক্ষোভের কোন কারণ নেই।

তুমি এতো জানো, অসারে বলল জর্জি।

য-ফুল। মেয়েরা যদি পুরুষদের চেয়ে বেশী না জানত তা হলে পুরুষরা বল্গাহীন ভাবে সংসারে উৎপাত সৃষ্টি করত। সংসার বাঁচাতেই তো বেশী জানতে হয়।

বুঝলাম না।

বুঝে কাজ নেই। চল পার্কে গিয়ে বসি। ছবি শেষ হলে এক সাথে ফেরা যাবে।

বরং হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে যাই।

আর ওদিকে আঈবুড়ি খুঁজে খুঁজে সারা হোক। দাঁড়াও, ওদের বলে আসি। বলেই জিজা ছুটল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলল, চল।

পথ চলতে ঘুরিয়ে নিল আলোচ্য বিষয়। জিজা বলল, ইতি-বিখ্যাত এই দেশ। বাহমনি রাজ্যকাল থেকেই এটা ছিল মুসলমানদের ঘাঁটি। বহু হাত বদল হয়ে শেষ অবধি নিজামের কুক্ষিগত হয়েছিল এই দেশ।

পড়েছি ইতিহাসে।

ইতিহাস অনেক পড়েছ, আসল দেশটাতো দেখনি। এবার দেখ। আজব দেশ এই হায়দ্রাবাদ।

বাধা দিয়ে জর্জি বলল এখানেই তো তুমি বড় হয়েছ।

হাঁ বললে ভুল হয়। পড়তাম পুণাতে, ছুটিতে আসতাম মায়ের কাছে। এই ভাবে দশ বছর কেটেছে। দু' বছর কলেজেও পড়েছি, সে সময় এখানেই পড়তাম। এক টানা দু' বছর এখানে থেকেছি সেই সময়। মাঝে মাঝেই মায়ের সাথে বোম্বাই গিয়ে থেকেছি, সেজন্য ঠিক হায়দ্রাবাদে বড় হয়েছি বললে ভুল হবে।

ওঃ, বলে জর্জি অন্যমনস্ক ভাবে চলতে লাগল। জিজার কথাই ভাবছিল। জিজা ছুটে এসেছে তার মায়ের কাছে অথচ তাকে আসতে দেয় নি কেন! জিজা হোল কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। তাকে বুকে টেনে নিতে যদি পেরেছে তার মা তাহলে নিজের সন্তানকে কেন কাছেও আসতে দেয়নি সে! কেন দেয় নি! জর্জি উত্তর খুঁজে পেল না।

কথা বলছ না কেন? কি ভাবছ?

চোদ্দ পনর বছর মায়ের সঙ্গ ছাড়া। সেই কথাই ভাবছি। আর ভাবছি, তোমার মত বাক্‌চতুর আরেকটা মেয়েকে দেখেছি, আমার বন্ধুর স্ত্রী মেরীকে। কিন্তু, না থাক।

ব্যাকালাপ বন্ধ করে জর্জি চলতে থাকে। জিজাও নতুন করে কোন প্রস উত্থাপন করতে কোন আগ্রহ দেখাল না। দুজনেই নীরবে চলতে লাগল।

জর্জি ভাবছিল জ্যাকোবাইনের কথা। আত্মকেন্দ্রিক জ্যাকোবাইন সন্তানে ভবিষ্যত গড়ে দিতে যে অভিনয় করে চলেছে, যে ভাবে নিজের সাময়িক লাভে আশায় অপরকে টেনে নামিয়েছে বিপথে, সে কথা ভাবতে ভাবতে জর্জি মনে মে শিউরে উঠছিল। জিজার চটুল বাক্যালাপের পশ্চাতে যে সরল নিষ্কলুষ হৃদয়টি দেখতে পাচ্ছিল, তার কণিকাও সে খুঁজে পায়নি মেরীর আর জ্যাকোবাইনের জীবন ধারায়।

বাড়ির সামনে আসতেই গেট খুলে দাঁড়াল সেই তেলিঙ্গা দারোয়ান। কোনদিবে না তাকিয়ে জর্জি আর জিজা সোজা চলে গেল নিজ নিজ আস্তানায়।

জামা কাপড় বদলে জর্জি একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার বাল্যের সেই ফটোখানা দিকে। জিজার কাছে শুনেছে, এই ফটোখানা তারই। চক্ষুর অন্তরালে রেখে জননী তার প্রতিকৃতিকে সাজিয়ে রেখেছে, প্রতিদিন এই প্রতিকৃতিখানা হয়ত ঝেড়ে পুঁছে রেখে স্নেহের ক্ষুধা মিটিয়েছে তার মা। জর্জি ভাবতে চেষ্টা যতই করতে থাকে ততই অস্থির হয়ে উঠে ভেতরে ভেতরে।

সকালে রাঘবনের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল জর্জির। দরজা খুলে দাঁড়াতেই রাঘবন বলল, শেষ রাতের গাড়িতে বেগম বোম্বে থেকে ফিরে এসেছে।

চোখ ডলতে ডলতে জর্জি বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল, মা!

হাঁ, উনি এসেই খবর পেয়েছেন তুমি এসেছ। এসে দেখলেন তোমার দরজা বন্ধ। ফিরে গেছেন, বিশ্রাম করছেন।

জর্জি উঠিপড়ি করে মুখ ধুয়ে রাঘবনের পেছন পেছন মায়ের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, মা।

ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এস।

জর্জি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ভেতরে।

বস।

জর্জি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল আট বছর আগে যে মাকে সে দেখেছে, এ মা কি সেই মা! জর্জি মনে মনে খুঁজে দেখছিল, না! এ মা সে মা নয়। সিনেমার ছবিতে যে মাকে দেখেছে, এ মা সে মাও নয়।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

জর্জি সামনের সোফায় বসল।

এসেই শুনলাম তুমি এসেছ।

থামল নাজমা বেগম। জর্জি ঘেমে উঠল। ভেবেছিল, প্রথম সাক্ষাতে ব্যাকুলতাভরা দৃষ্টি নিয়ে মা এগিয়ে এসে বুকে তুলে নেবে। তার বদলে লক্ষ্য করল মায়ের মুখের শক্ত মাংসপেশী আর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। ক্ষোভের প্রচণ্ডতায় জর্জির ভেতরটা যেন তীব্র আলোড়নে অস্থির হয়ে উঠল।

না জানিয়ে এলে কেন? কঠিন প্রশ্ন করল নাজমা বেগম।

আট বছর! আট বছর পর এই কি মায়ের আহ্বান। জর্জি নির্বাক হয়ে বসে রইল।

নাজমা বেগম তীক্ষ্ণভাবে বলল, কথা বলছ না কেন?

ধীরে অথচ স্পষ্টভাবে জর্জি বলল, অপরাধ হয়েছে। একটি প্রশ্ন আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে তোমার কাছে। উত্তর পেলেই ফিরে যাব। আজ অবধি সে প্রশ্নের জবাব পাইনি, সে জবাব একমাত্র তুমিই দিতে পার।

প্রশ্নের উত্তর যদি তোমার মনঃপুত না হয়।

যদি যুক্তিসহ হয় আবার ফিরে যাব বন্দীশালায়, সেখান থেকে যেখানে যেতে বলবে সেখানে। যদি না হয় তা হলে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিন্ন করে তোমার কাছ থেকে চির বিদায় নেব। আমি জানতে চাই, কোন অপরাধে গত আট বছরে একবারও তুমি আমার কাছে যাওনি, অথচ আমাকে ডেকে কাছে নাওনি!

নাজমা বেগম প্রস্তুত ছিল এই প্রশ্নের জন্য। বলল, বিশেষ কারণ আছে।

সেই বিশেষ কারণটি জানতে চাই।

জানতে চাও। বেশ। তোমাকে ডেকে পাঠাব, বলব, বলব সবই।

বলেই গম্ভীর হয়ে গেল নাজমা বেগম। সন্তানের কাছে পরাজয় স্বীকার করল মনে মনে। স্বীকার করতে বাধ্য হল সন্তানের অনন্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে। নাজমা বেগম উঠে দাঁড়িয়ে জর্জির মুখের দিকে চেয়ে রইল। অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, আজই বলব, আজই বলব। সাক্ষ্য রইবে ঘরের চারটি দেওয়াল আর অদৃশ্য ভগবান। মা তার নিজস্ব পরিচয় দেবে নিজের সন্তানকে।

জর্জি মাথা নীচু করে ফিরে গেল তার নিজের ঘরে।

॥ ২ ॥

পেত্রো ডি-সুজা ফ্রাংকাইন এসেছিল লিসবন থেকে সরকারী চাকরি নিয়ে। —কাহিনী আরম্ভ করল নাজমা বেগম। ঘরের দরজা বন্ধ, সামনে বসে জর্জি। ঘরের মৃদু নীল আলোতে দুজনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছে।

বলল : থাকতো সে মার্মাগোয়াতে। এই পরিচয়টুকু পেয়েছিলাম তোমা ঠাকুরদাদার।

থেমে গেল নাজমা বেগম। অন্যমনস্কভাবে ভাবতে লাগল।

জর্জি উন্মুখ ভাবে বলল, তারপর?

এই পরিচয়টুকু জেনেছিলাম তোমার ঠাকুমার কাছ থেকে। কোন একসম সরকারী কাজে পেত্রো দক্ষিণ গোয়াতে এসেছিল। সেখানে ছিল এক মালাবারী দম্পতি। তাদের ছিল ছোট্ট মুদিখানা দোকান। আসলে সেটা ছিল চোরাই মালের ঘাটি। বিজে নায়ার দিনের বেলায় দোকান খুলে বসত, রাতের বেলায় সমুদ্রের ধারে পাহারা দিত, ছোট ছোট নৌকা ভিড়লে চোরাইমাল পাচার করত। উপার্জন হত যথেষ্ট। মালাবারী দম্পতি সুখেই ছিল।

পেত্রো ছিল সীমান্ত প্রহরীর প্রধান। সদলে হানা দিত রাতের বেলায়, চোরাকারবারীদের পেছন ধাওয়া করত মাঝে মাঝেই। একদিন চোরাই চালান বন্ধ করতে গুলী চলেছিল সমুদ্রের কিনারায়। গুলীতে প্রাণ হারাল বিজে নায়ার।

সংবাদ পৌছাল তার বাড়িতে।

অল্প বয়স্ক স্ত্রী আম্মা নায়ার প্রাণ খুলে কাঁদতেও পারেনি। পর্তুগীজ জলদস্যুদের রাজ্যে মৃতের স্ত্রীর কাঁদাও বোধহয় নিষেধ ছিল, নয়ত আতঙ্ক ছিল পরবর্তী অত্যাচারের। আম্মা নায়ার ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়।

পেত্রো হানা দিল বিজে নায়ারের দোকানে। বাজেয়াপ্ত করল বিজে নায়ারের সব সম্পদ। তারপরই হানা দিল তার বাড়িতে। খুঁজে পেতে বের করল কয়েক সের সোনা আর আম্মা নায়ারকে।

পরের ইতিহাস জানি না। এই আম্মা নায়ার তোমার ঠাকুর মা। আর পেত্রো ডি-সুজা ফ্রাংকাইন তোমার পিতামহ।

কি করে আম্মার সাথে পেত্রোর বিয়ে হয়েছিল তা জানিনা। তোমার মায়ের দুঃখ-কষ্টকে তোমার বাবা অনুভব করতেন। তিনিই বলেছিলেন, পেত্রো আম্মাকে রেখে লিসবন গিয়েছিল। তখন তোমার বাবার বয়স মাত্র সাত বৎসর। পেত্রো আর মার্মাগোয়াতে থেকে ফিরে আসেনি। তোমার ঠাকুমার ওপর দায়িত্ব পড়ল তোমার বাবাকে বড় করবার। পেত্রো অধর্ম করেনি। বিজে নায়ারের লুণ্ঠিত সম্পদ আম্মাকে দিয়ে গিয়েছিল যাবার সময়। সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল, মোম্বাসায় পেত্রো ফিরে এসেছিল লিসবন থেকে, সেখানেই সে কলেরা হয়ে মারা যায়।

আম্মার মাথায় গুরুতর দায়িত্ব। ছেলে বড় হতেই তাকে পাঠিয়ে দিল বোম্বেতে।

সেখানে মিলার্ড লেখাপড়া শিখল। বি-এ পাশ করে মিলার্ড ফিরে এল মার্মাগোয়াতে। তখন সে উঠতি বয়সের স্বাস্থ্যবান যুবক।

আম্মা বলল, সরকারী চাকরি নে মিলার্ড।

মিলার্ড বলল, কোন্ সরকারের?

কেন! যে সরকারের চাকরি করত তোর বাবা।

নেভার, নেভার। পাইরেটের চাকরি আমি করিনা।

বোম্বে থেকে মিলার্ডের দৃষ্টিভঙ্গী গিয়েছিল বদলে।

তোমার ঠাকুমা বলল, দরকার কি চাকরির। তার চেয়ে ব্যবসা বাণিজ্য কর। আমার কিছু সঞ্চয় আছে তাই নাড়াচাড়া কর।

ব্যবসাতো করতেন অনেকে, সে ব্যবসা এই গোয়াতে চোরাই ব্যবসা। ওর চেয়ে চাকরি ভাল। মেহনত করে মাস কাবারে খুদকণা যা পাব তাই দিয়ে দিন গুজরান করব। ওসব আমার কর্ম নয়, পারব না।

আম্মা হাল ছেড়ে দিল, বলল, যা খুশী তাই কর।

তোমার বাবা বের হলেন চাকরি খুঁজতে। পর্তুগীজ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে এলেন ইংরেজ রাজ্যে, সেখানেও তার মনস্থির হল না। দেশীয় রাজার দরবারে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে ছোট রধনপুর রাজ্যে পেলেন কাজ। রধনপুরের ঠাকুরসাহেব দয়া করে আবগারী বিভাগে কাজ দিলেন।

মিলার্ড একাই এল রধনপুরে। আম্মা রয়ে গেল মার্মাগোয়াতে।

রধনপুর ছোট শহর। বলতে গেলে একটা বড় গ্রাম বলা যায়। ঠাকুরসাহেবের রাজ্য তিরিশ পঁয়ত্রিশটা গ্রাম নিয়ে। রাজ্যের আয় ছিল আবগারীতে বেশি। সেখানে মোট পুলিশের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন। বেতন তারা পেত তিন টাকা। দারোগা পেত কুড়ি টাকা, কিন্তু আবগারী ইন্সপেক্টরে পেত পঞ্চাশ টাকা। কারণটাতো বলেইছি। একজন ইন্সপেক্টার আর একজন কেরানী সহ আটজন আরদালী হল গোটা বিভাগের কর্মচারী। বেতনের পাচগুণ তারা পেত উপরি। তাই পুষিয়ে যেত সবারই। ইন্সপেক্টরদের ক্ষমতা ছিল হাকিমের মত। ছোট খাট মামলা মোকদ্দমা তারাই বিচার করত। মিলার্ড হল আবগারী ইন্সপেক্টার এবং হাকিম।

আবগারী অফিসের বাড়ি দোতালা।

নীচের তলায় এজলাস আর অফিস। অফিসের পাশে খাস আরদালি নিয়ামতুল্লা থাকত সপরিবারে। দোতালায় থাকত হাকিম মিলার্ড।

নিয়ামতুল্লার দুই ছেলে আর তিন মেয়ে। বিবি ছিল দুটো। দুই ছেলে আর দুই মেয়ে বড় বিবির। আর এক মেয়ে তার ছোট বিবির। ছেলেরা চাকরি

করত রধনপুর সরকারে, দুটো মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তারা আলাদা থাকতো তাদের মাকে নিয়ে। বাকি ছিল এক মেয়ের বিয়ে। সে মেয়ের নাম সাইদা।

থেমে গেল নাজমা বেগম।

অনেকক্ষণ দেওয়ালের দিকে চেয়ে থেকে আবার শুরু করল তার কাহিনী।

সেই সাইদা-ই তোমার মা।

জর্জি চমকে উঠল, বলল, আমার মা সাইদা!

হাঁ। নাজমা তার নতুন পরিচয়।

মিলার্ড যখন চাকরি নিয়ে এল তখন তার বয়স তেইশ চব্বিশ।

আমার বয়স তখন বার পেরিয়েছে।

নতুন সাহেব আসতেই নিয়ামতুল্লা ব্যস্ত হয়ে উঠল। আগের সাহেব ছিল কচ্ছি হিন্দু। তাদের আচার ব্যবহার ছিল আলাদা ধরণের। কৃশ্চান মিলার্ডের সাথে তাদের মিল ছিলই না। বয়স তার কম, সঙ্গে মা-বোন কেউ নেই। একাই রেঁধে খেত মিলার্ড। নিয়ামতুল্লা সাহেবকে খুশী করতে ব্যস্ত। নতুন সাহেবকে হাতে রাখলে উপার্জনটা ভালই হয়। এই আশায় খোসামোদ করত তাকে। নেমতন্ন করত মাঝে মাঝে। অবশেষে স্থির হল মিলার্ড খরচ দেবে, নিয়ামতুল্লা তাকে রান্না করবার দায়মুক্ত করবে। আর সেই আহার্য পরিবেশন অর্থাৎ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল সাইদা।

প্রথম দিন-ই মিলার্ড জিজ্ঞাসা করল, খুকী কোন ক্লাশে পড়।

ওড়নাটা ভাল করে মাথায় দিয়ে বললাম, আমি খুকী নই, আমি সাইদা। আমি পড়ি না।

মিলার্ড গম্ভীর হয়ে গেল।

নিজের মনেই খেতে লাগল। খেতে খেতে সহসা বলল, পড়বে?

পড়ার ধকল যে কি তা জানতুম না। সহজেই মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম।

পরদিনই মিলার্ড বই সংগ্রহ করল, খাতা পেনসিল জুগিয়ে দিল। তার কাছে হাতেখড়ি হল আমার। ইস্কুলের বাঁধাধরা পড়া নয়। আমি আগ্রহের সাথে পড়া তৈরী করি।

নিয়ামতুল্লা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। আমার মা যে খুশী হতেন তা নয়। কৃশ্চানের সাথে মেলামেশায় বাধা দিতেন মাঝে মাঝে, তবে বয়সটা কম বলে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। দেখতে দেখতে বছর পেরিয়ে গেছে। পড়াশোনায় অনেকটা এগিয়ে গেছি। আর সেই সাথে এগিয়েছি বয়সে। মিলার্ডের সেদিকে

লক্ষ নেই, সে অফুরন্ত উৎসাহে পড়িয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম যে ভাবে পড়তে যেতাম, তখন তা পারতাম না, কেমন বাধো বাধো ঠেকতো।

আরও একটা বছর প্রায় পেরিয়েছে। ইংরেজিতে লিখতে পড়তে কথা বলতে শিখেছি। কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি হলেও মোটামুটি ভালই শিখেছি এর মধ্যেই।

মিলার্ডের মা এলেন।

আম্মা নায়ার মিশুকে লোক, ব্যবহারও ভাল কিন্তু হিন্দুঘরের মেয়ে। কৃশ্চানকে বিয়ে করলেও কুসংস্কারগুলো তখনও ছাড়তে পারেননি।

একদিন দোতালার সিঁড়িতে পা দিয়ে শুনতে পেলাম আম্মা বলছেন, মেয়েটি খুবই সুন্দর, তবে কিনা মুসলমান।

মিলার্ডের গলা শুনতে পেলাম। সে উত্তেজিত ভাবে বলল, মোছলমান কি সুন্দরী হতে পারে না।

না বেটা তা নয়। অমন সুন্দর মেয়েটাকে যদি ঘরের বউ করতে পারতাম! বাট্ এ হিদেন, সম্ভব নয়।

প্রতিবাদ জানিয়ে মিলার্ড বলল, জান সাইদা আমার ছাত্রী। সে বয়সে খুকী। হিদেনের কথা ছেড়ে দাও। ওর সাথে আমার বিয়ের কথা কি করে ভাবতে পারলে আশ্চর্য!

দূর বেটা। আম্মা তাড়া দিয়ে বলল, মেয়েদের খুকীত্ব বার বছরেই কেটে যায়। সাইদার বয়স তের চোদ্দ তো হবেই। ভাল খেতে পরতে পেলে ওকেই বড় মনে হত। ও সব যাক, বিয়ে যখন হতেই পারে না তখন আর বেশি মেলামেশা করিস না।

চোরের মত দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনলাম। লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। দৌড়ে পালিয়ে এলাম নিজের ঘরে। লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

সেই দিন-ই প্রথম মিলার্ডকে খুঁজে পেলাম নিজের মনে। হয়ত কোনদিন তার সাথে বিয়ে হবার স্বপ্ন দেখবার সাহসও পেতাম না, কিন্তু আম্মা আমার অজান্তে এই আশার বীজ আমার মনে বপণ করে দিলেন।

পরদিন থেকে পড়া বন্ধ। আর গেলাম না দোতালায়। বাবা খবর করতে বলেছিলেন, তার কথাও রাখিনি। ঘরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখলাম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল রুটিন ওয়ার্ক না করাতে কি যেন ভুল করে বসেছি। মনের হিসাবে দেখলাম, জমাখরচের পৃষ্ঠায় কে যেন এক দোয়াত লালকালি ঢেলে দিয়েছে। সব কিছুই ঝাপসা বোধ হচ্ছিল।

ভেবেছিলাম বোধহয় খুব শোধ নিয়েছি। বিকেল বেলায় জানালায় বসে মনে হচ্ছিল, একবার যাই, আরেকবার মনে হচ্ছিল, না যেয়ে কেমন জব্দ করেছি! মিলার্ডকে দেখলাম সরকারী পোশাক পরে বেরিয়ে যেতে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখতে পেলেও সে আমাকে দেখতে পায় নি। মিলার্ড একবার ফিরে তাকাল জানালার দিকে, বিষণ্ণ মনে হল তাকে। সুন্দর-সুঠাম, গৌরবরণ লোকটিকে হঠাৎ মনে হল রাহুগ্রস্ত চাঁদ। সে যখন হেঁটে যাচ্ছিল আমি তাকে দুচোখ ভরে দেখছিলাম, তার রূপসুধা পান করছিলাম অস্থির হৃদয়ে।

সেই দিন প্রথম জানলাম, মিলার্ড আমার হৃদয়ে স্থায়ী আসন গড়ে নিয়েছে। অভিমান আমাকে আটকে রাখল, শত চেষ্টা করেও মিলার্ডের সামনে আর যেতে পারিনি পরপর আট দশ দিন। প্রথম দু-একদিন বাবা এসে বলতেন, সাহেব জিজ্ঞাসা করছিল তুই কেমন পড়াশোনা করছিস?

আমি বলেছিলাম, আর পড়ব না বলে দিও।

অবশেষে হার মানতে হল।

একদিন দুপুরে সংবাদ পেলাম আম্মা সেই রাতেই ফিরে যাবেন মার্মাগোয়াতে। এই তো সুযোগ। আম্মার সাথে দেখা করবার অছিলায় মিলার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। মিলার্ডকে জবাব দেবার সুযোগ পাব। চুপি চুপি বিকেল বেলায় আম্মার কাছে গেলাম। আম্মা তখন বিছানা পেঁটরা গুছোচ্ছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন, কদিন আসিসনি কেন রে মেয়ে।

শরীর ভাল ছিল না। বাড়িতেও অনেক কাজ ছিল মা।

তাও তো একবার আসতে হয়।

রাগ হল আমার। আম্মাই আমার আসা যাওয়া পছন্দ করেন না, কেননা আমি হিদেন। অথচ অনুযোগ আর অভিযোগ তিনিই করছেন। রাগে আত্মহারা হয়েছিলাম নিশ্চয়ই, বললাম, ক্রশ্চানদের ঘরে হিদেনের আসা কি ভাল।

আম্মা বুদ্ধিমতী, প্রথমে গম্ভীর হয়ে গেলেন। সহজেই নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললেন, চুরি করে আমার কথা তুই শুনেছিস, নয় কি! হিদেনকে আসতে মানা করিনি।

আপনি তো পছন্দ করেন না।

করি রে করি। খুব বেশি পছন্দ করি। যখন ভাবছিলুম তোকে ঘরের বউ করব তখনই বাধা এল। সে চিন্তা মন থেকে বিদায় নিয়েছে, তাই তোর আসা যাওয়া অপছন্দ করবার কোন কারণই আর নেই। বাই জোভ্, আই লাইক ইউ, লাভ ইউ। আমার থুতনিতে হাত দিয়ে বলল, তোকে পেলে উঃ কি আনন্দ!

উত্তর দিতে পারলাম না। ধর্মের গণ্ডীতে আটকে গেছি দেখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাকে সি অফ্ করবিনে ?

মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ।

তা হলে প্রস্তুত হয়ে নে, আমিও প্রস্তুত হই।

রাতের প্রথম ট্রেন ধরতে মিলার্ডের সাথে আম্মা রওনা হলেন, আমিও ঘোড়ার গাড়িতে আম্মার পাশে জায়গা করে নিলাম। পথ চলতে চলতে আম্মা বললেন, তার বাল্যজীবনের কথা। বিজে নায়ারের সাথে বিয়ের কথা। বলতে বলতে হেসে বললেন, সত্যি কথা বিজের কাছে টাকা পেয়েছিলাম, কিন্তু বিজেকে পাইনি; পেত্রোর কাছে টাকাও পেয়েছি পেত্রোকেও পেয়েছি। সাত আট বছরে কোন দিন কষ্ট দেয় নি সে। ফেরিঙ্গি হলেও তার মনটা ছিল তুলোর মত নরম। প্রথম প্রথম যখন কাঁদতুম তখন কত কথা বলে, কত জিনিস এনে আমাকে প্রবোধ দিত।

বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আম্মা।

আমি গাড়ির অন্ধকারে শুধু মাথা নেড়ে 'হুঁ' দিয়ে চলেছি। পথ ফুরিয়ে গেল। ষ্টেশনে এসে গাড়ি পেলেন আম্মা। তাকে গাড়িতে বসিয়ে রওনা করে ফিরলাম নিজেদের আস্তানায়।

ফিরবার পথে মিলার্ড কোন কথাই বলে নি। সারাটা রাস্তা গুমোটের মধ্যে কেটে গেল। অভিমান কঠিন দাগ কাটল মনে। সোজা এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, কেঁদে ভিজে গেল মাথার বালিশ।

পরদিন সকালে অভিমানকে খুঁজে পেলাম না। চোখের জলে মনের অভিমান ভেসে গেছে। নিজের অজান্তে মিলার্ডের ঘরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিলার্ডও মাথা নীচু করে নথিপত্রে মন দিয়েছে। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না।

ডাকলাম, সাহেব।

নথিপত্রের দিকে মুখ রেখেই মিলার্ড উত্তর দিন, কেন ?

মিথ্যে করে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি।

কোথায় ?

যেখানে মেয়েদের জায়গা।

চমকে উঠে মিলার্ড জিজ্ঞাসা করল, মানে ?

শোনেননি বুঝি।

নাতো !

বুঝলাম, ওষুধ কাজ করেছে। মিলার্ড অস্থির হয়ে উঠেছে মনে মনে। চোখ-মুখ গরম হয়ে উঠল আমার। মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিলার্ড কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সরল ভাবে বলল, তা হলে সাদি।

জানি না, বলে ছুটে পালালাম।

বিকেল বেলায় বাসার পেছনে ছোট্ট বাগানটায় ঘুরছিলাম, মাঝে মাঝে ফুলের গাছে জল দিচ্ছিলাম। মিলার্ড দাঁড়িয়ে ছিল দোতালার বারান্দায়। মুখ তুলে তাকাতেই ইসারায় ডাকল। আমি যেন দেখতে পাইনি এমনি ভাবে নিজের কাজ করে চললাম। ঝাড়িতে জল নেই, তবুও সেটা উল্টে ধরছি ফুলগাছের গোড়ায়। এমনি করে বিকেলটা কাটিয়ে এসে বসলাম নিজের ঘরের জানালায়। পিওন রামজি আলো জ্বেলে দিল মিলার্ডের ঘরে, সিড়িতে লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেল। আমি চুপি চুপি উঠলাম। চুপি চুপি দোতালায় মিলার্ডের জানালার পাশে দাঁড়ালাম।

মিলার্ড আমার প্রতীক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই সে ডাকল, সাইদা।

উত্তর দিলাম না।

মিলার্ড উঠে এসে আমার হাত ধরতেই ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম। ধমকে বললাম, কেন আমার হাত ধরলেন? মেয়েদের হাত ধরা অশোভন তা বুঝি জানেন না।

অন্যমনস্ক হয়ে গেল মিলার্ড। এতটা সে আশা করেনি। কাতরস্বরে বলল, অপরাধ হয়েছে মাপ কর।

চাপা গলায় বললাম, কখনই নয়। জানেন আমি হিদেন।

মিলার্ড ভয়ে শীর্ণ হয়ে গেল। কি বলবে ভেবে পেল না।

আপনার মা বলেছেন, হিদেনের সাথে মেলামেশা করা ভাল নয়।

না! দৃঢ় কণ্ঠে মিলার্ড বলল। আমার মা বেশি মেলামেশা করতে বারণ করেছেন, কেননা তোমার মনে যদি কোন অশান্তি প্রবেশ করে সে অশান্তি মোচন করবার সামর্থ্য হয়ত আমার নেই, এই কথা তিনি মনে করেন। তুমিও তা নিশ্চয়ই সমর্থন কর।

বললাম, একই কথা।

তা নয়। যদি তাই তুমি জান, তা হলে কেন এসেছ এখানে।

আর আসব না, বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম।

মিলার্ড হেসে বলল, পরের মেয়ে, তাও হিদেন, উপরি পাওনা তোমার সাদি। না আসলেই ভাল হত।

এসেছি বলে মারবেন কি!

হো-হো করে হেসে উঠল মিলার্ড। আমার অভিনয় অনবদ্য হলেও ধরা পড়ে গেলাম। মিলার্ড হাসি থামিয়ে বলল, মারব নিশ্চয়ই। এখন নয়, যদি কোন দিন তোমাকে নিজের মত করে পাই সেদিন ঠিকই মারব। সেদিন যে আঘাত দেব সে আঘাত সহ্য করতে পারবে তো ? সে আঘাত ভুলতে পারবে কি ?

থামল নাজমা বেগম।

জর্জি অনিমেষ নয়নে নাজমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দম নিয়ে নাজমা বলল, সত্যিই ভুলতে পারিনি জর্জি। আঘাত যে দিন এল সেদিন সান্ত্বনাও খুঁজে পাইনি। অবশ্য সে আঘাত আমাকে সত্যকার পথও দেখিয়েছিল। সেই ব্যথা আছে বলেই আমি নিজেকে এত শক্ত করতে পেরেছি। নইলে জোয়ারের ধাক্কায় ভেসে যেতাম।

এবার বইপড়া শেষ।

একদিন একটা বীণা হাতে করে এসে মিলার্ড বলল, এটা চেন ?

চিনি। কি হবে এটা দিয়ে ?

তুমি গান গাইবে, আমি শুনব।

আমি তো গান জানিনা।

তুমি কি লেখাপড়া জানতে ? শিখতে হয়। এটাও শিখবে।

বাবা-মা রাগ করবেন।

তা বটে। ঘরে বসে শিখবে। ওস্তাদ আসবে। দেখবে কেউ কিছু বলবেনা।

ঘরে বসেই শিখতাম। অসুবিধা ছিল না। বয়সটা আরও এক বছর এগিয়ে গেল।

মায়ের চোখে বয়সটা ভাল করেই ধরা পড়েছে। বাবাকে বললেন, সাইদার ব্যবস্থা কর। বাবা আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, খোদা ব্যবস্থা করবে। লেখাপড়া জানা মেয়ে গানবাজনাও শিখেছে, তাকে তো যার তার হাতে তুলে দিতে পারি না। মা ছিলেন কোপনস্বভাব। রাগের মাথায় বললেন, তোমার মেয়ের জন্যে নিজাম ছুটে আসবে নাকি ?

বাবা পালিয়ে বাঁচলেন। তা বলে কথাবার্তা বন্ধ রইল না। বাবা হারলেন, মা জিতলেন। অচিরেই বিয়ের কথা নিয়ে ছোটাছুটি শুরু হল। মুসলমানের ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করে অভিভাবকরা, কলমাপড়ার আগে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাত ঘটেনা। বিয়েটা শুধু দলিল, সেখানে ধর্ম অথবা মতের প্রাধান্য ঘটে পরে। আগে নয়। আমি শঙ্কিত হলাম। বললাম, মিলার্ডকে। মিলার্ডের অজ্ঞাত ছিল

না কিছুই কিন্তু সে ছিল নির্বিকার। বাধ্য হয়ে নিজেই বললাম, পালে বাঘ পড়বে এবার।

মিলার্ড হাসল, বলল, পড়েনি, পড়বার আশঙ্কা আছে।

তুমি তো বেশ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ।

তা বই কি। তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারলে আমি তাতে বাধা দেব কেন। হোক না তোমার বিয়ে, দেখবে কেমন প্রেজেন্ট করব।

এই জন্যই বুঝি লেখাপড়া শেখালে, গান শেখালে।

নিশ্চয়। ভবিষ্যতে যদি কোন বিপদ হয় ঐ দুইটোই তোমাকে রক্ষা করবে। তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই তো এত করেছি।

কেঁদে ফেললাম। অভিমানে আমার গলাটা যেন ধরে গেল। মুখ ফুটে যা বলবার তা বলতে যেন পারছিলাম না।

মিলার্ড এতদিন যে সংযম দেখিয়েছে আমার চোখের জলে সেই সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। ধীরে ধীরে উঠে এসে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিল।

সেই আমার জীবনের সূর্যোদয়, সেদিন নবজীবনের পথ দেখলাম !

কাছে বসিয়ে মিলার্ড পরামর্শে বসল। বলল, আমার মায়ের কাছে তোমাকে যেতে হবে।

কেন ?

মায়ের আশ্রয় পেতে।

তোমার মা আশ্রয় দিলেই তো আমার বাবা রাজি হবেন এমন কোন স্থিরতা নেই।

তা জেনেই তোমাকে যেতে বলছি। একা যেতে হবে।

তুমি যাবে না ?

না ! আমার সাথে তোমার যোগাযোগ আছে জানলেই আইনের প্যাঁচে পড়ব আমি। অবশ্য ঠিক সময় মত আমি উপস্থিত হব, তোমাকে ভাবতে হবে না। আইনের চোখে তুমি নাবালিকা।

আমি যদি কৃশ্চান হই।

তা হলেও নিষ্কৃতি নেই। বিবাহের সাথে ধর্মের কোন যোগ নেই। স্বেচ্ছামূলক বিবাহে বাধা কেউ দিতে পারে না, অবশ্য যদি বিবাহার্থীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

বেশ একাই যাব। তুমি কতদিনে আসবে সেখানে ?

এক মাসও হতে পারে, এক বছরও হতে পারে। সব সমস্যার শেষ পরিণতি না দেখে তো যেতে পারছি না।

বেশ।

অবশ্য এর প্রাথমিক ব্যবস্থা করতে কালই আমি বেরিয়ে পড়ব। ফিরে এসে যা করবার তা তোমাকে বলব।

পরদিন সকালেই মিলার্ড ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তিন দিন পরে মুখ শুকনো করে ফিরে এল। চুপি চুপি গেলাম তার কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আম্মা কি বললেন ?

মা রাজি হলেন না।

আমার মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল। বললাম, তা হলে কি হবে ?

ভয় নেই। মার্মাগোয়া ইংরেজের রাজ্য নয়। সেখানে বাড়িভাড়া করে এসেছি। তুমি সোজা গিয়ে উঠবে সেখানে। এক প্রৌঢ়া দাসী আর একটি ছোকরা চাকর ঠিক করেছি, তারাই তোমাকে দেখাশোনা করবে।

বললাম, অল্ রাইট।

একটু ধৈর্য ধরো। কাল আমার টুরে বের হতে হবে। ছ'দিনের প্রোগ্রাম নিয়েছি। তোমার বাবাকে সাথে নেব। তুমি এই ছ'দিনের যে কোন দিন বেরিয়ে পড়বে। পারবে তো ?

তুমি ভরসা দিলে পারব না কেন !

সো আই লাভ্ ইউ, বলে মিলার্ড নথিপত্র নিয়ে বসল। সাদা কাগজে মার্মাগোয়া যাবার পথ ঘাট লিখে দিল। আর দিল একটা নিযুক্তি পত্র। যেন চাকরি নিয়ে যাচ্ছি।

মিলার্ড টুরে বের হবার তৃতীয় দিনে প্রস্তুত হলাম। রাতের গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে। একা চলতে ভয় করছিল, পথও কম নয়। মিলার্ডের শেখা বুলি আউড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর সোয়ারী হয়ে পৌছে গেলাম মার্মাগোয়া। সোজা এসে উঠলাম মিলার্ডের দেওয়া ঠিকানায়। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ঝি আর চাকর। সেই ঝি-চাকর আজও রয়েছে, সে ঝি হল আঙ্গবুড়ী আর চাকর হল রাঘবন !

প্রথম কদিন লজ্জা ও ভয়ে ঘর থেকেই বের হতাম না। আঙ্গবুড়ি আর রাঘবনের সেবায় ও সহযোগিতায় অনেকটা নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম কিন্তু একমাস পেরিয়ে গেলেও মিলার্ড না আসাতে ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়লাম। উৎকণ্ঠার কথা কাউকে বলতেও পারি না। প্রতিদিন আশা করতাম তার উপস্থিতি, না হয় তার

পত্র। কোনটাই পূর্ণ হত না। পাগলের মত ছট্‌-ফটিয়ে ঘুরতাম ফিরতাম গোপনে চোখের জল ফেলতাম।

সন্ধ্যা বেলায় ছাদের আলসেতে বসে থাকতাম। বিষণ্ণ সায়াহ্ন আমার বিষণ্ণতায় আরও বেশি বিষণ্ণ হয়ে উঠত। আজ দেড়মাস যাবত এই সময়টুকু বেছে নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম দূর সমুদ্রের দিকে। মন্দ লাগত না।

সেদিন রাঘবন এসে খাম দিল হাতে।

হাতের লেখা দেখে চিনতে পারলাম না, লেখক কে? ছিঁড়ে ফেললাম খাম। মিলার্ডের হাতের লেখা, শিরোনামা কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। রধনপুরেও চিঠিখানা ডাকে দেওয়া হয় নি। বিশেষ সতর্কতা সহকারে চিঠি সে যে লিখেছে তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

ঃ টুরে থাকতে থাকতে তোমার বাবার কাছে তোমার দাদা এসে জানাল সাইদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই হল পত্রের সূচনা।

ঃ তোমার বাবা ছুটে এলেন আমার কাছে। হাউমাউ করে বললেন, সাহেব সাইদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গম্ভীর ভাবে বললাম, কোন তারিখ থেকে?

পরশু রাত থেকে।

হিসাব করে দেখলাম, এর মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছ মার্মাগোয়া।

পাড়ায় কোথাও যায়নি তো, কোন আত্মীয় কুটুম্বের বাড়িতে?

না সাহেব। সব খোঁজা শেষ।

প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে ফিরলাম রাজধানীতে। তোমার বাবাকে পাঠালাম থানায়।

ডায়েরী লিখিয়ে এল সব কিছু, শুধু আমার গোপন উপদেশমত বয়সটা লিখিয়ে এল উনিশ।

কেন লেখালাম! তোমার বাবাকে বললাম, মেয়ে যখন পালিয়েছে তখন তাকে ফেরত পাবার আশা নেই। বরং সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক ওরা। একটা ডায়েরী করতে হয় করে রাখ নইলে কোন সময় যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তা হলে তোমার ওপর দায়িত্ব চাপবে।

বুদ্ধিদাতা তার উপরওলা তার হাকিম।

মোক্ষম কথা লিখে দিয়ে তোমার বাবা ফিরলেন। পুলিশও খতেমি রিপোর্ট দিয়ে দায়িত্ব এড়াল।

আমার অভিনয়টা কেমন হয়েছে বলত? সেদিন তোমার বাবার মুখ দিয়ে আমার দুষ্ট বুদ্ধি কবুল করিয়ে রাতে ঘুমুতে পারিনি। শেষ অবধি ভেবে দেখেছি আমার প্রবলেম যদি সলভ্ করতে হয়, দ্যাট্ ইজ্ দি রাইট্ ওয়ে।

তারপর সব চুপচাপ।

মিলার্ডের পত্র পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। কিন্তু মিলার্ড কোথাও তার আসার কথা উল্লেখ করেনি। চিন্তা বৃদ্ধি পেল। অতঃপর কি!

থেমে গেল নাজমা বেগম।

সামনে বসে জর্জি ফ্রাংকাইন, নীরবে শুনছে তার মাতাপিতার পরিচয়।

॥ ৩ ॥

মিলার্ড এল মার্মাগোয়াতে।

দরজার সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম মিলার্ডকে। ছোট্ট একটা বিছানা আর সুটকেশ নিয়ে উপরে উঠতে উঠতে হাঁক ছাড়ল, সাইদা।

উত্তর দিলাম না। চুপ করে দরজার পাশে লুকিয়ে রইলাম। মিলার্ড ঘরে ঢুকে আমায় ডাকল, সাইদা।

দরজার পাশে থেকে বললাম, সি-ইজ্ ডেড্।

আই মেক্ হার এলাইভ্। বলে মিলার্ড দরজার পাশে থেকে আমাকে টেনে বের করল। হেসে বলল, অভিমান! এত যে বুদ্ধি খাটিয়ে, এত বিপদ মাথায় নিয়ে যে ছুটেছি তার বুঝি মূল্য নেই। বেশ!

দুঃখ হল মিলার্ডের জন্য। বুঝলাম তার হৃদয়কে। বললাম, অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর।

সেই রাতেই স্থির হল, মার্মাগোয়াতে আর নয়। এবার বোম্বের উপকণ্ঠে কোথাও ঘর ভাড়া নিতে হবে, কেননা মিলার্ড উইক্ এণ্ডে আসতে পারবে।

মিলার্ড বলল, আমার ছুটি মাত্র পাঁচদিন। এর মধ্যে তোমাকে বোম্বেতে ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করলেই নয়। অতএব এখুনি বোম্বে গমন বিধেয়। কাল আসছি।

বোম্বের উপকণ্ঠে থাকার বাসা সংগ্রহ হল বড় কষ্টে। সেখানেই চললাম। সঙ্গে গেল আঙ্গবুড়ি আর রাঘবন। ওরা আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। আজও ওরা আমার সঙ্গ ছাড়েনি।

সপ্তাহের শেষে মিলার্ড আসত। রধনপুরের গল্প বলত। সেখানকার লোক সাইদাকে ভুলে গেছে। নিয়ামতুল্লা পেয়াদার মেয়ে সাইদার সংবাদ নেবার লোক সেখানে কেউ-ই নেই।

মিলার্ডকে বললাম, সারাদিন একা থাকি, তার ওপর সপ্তাহে পাঁচটা দিন তুমিও থাকনা। খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকা পড়ে দিন কাটাই। এ কি বেশি দিন ভাল লাগে। চাতকের মত তোমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকি। অধীর প্রতীক্ষার সময় যেন কাটতে চায় না।

আমার কথা শুনে মিলার্ড চিন্তায় পড়ল। মনে হল, সে যেন কিছু করতে চায়।

সকাল বেলায় মিলার্ড বেরিয়ে গেল। বেলা দশটা নাগাদ একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে করে এসে বলল, তোমার গান শেখা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। তাই এই ওস্তাদ সাহেবকে ডেকে এনেছি। সপ্তাহে দুদিন, অর্থাৎ মঙ্গল আর বৃহস্পতিবারে তোমাকে গান শেখাবেন।

শনি, রবি, সোম মিলার্ডকে কাছে পেতুম। মঙ্গল-বৃহস্পতি কাটত গান শিখতে। বুধ আর শুক্র গানের সাধনা করতাম একা। সপ্তাহের কটা দিন কেটে যেত মোটা-মুটি। মিলার্ডের হিসাবটা মনে মনে মিলিয়ে খুশী হয়ে ছিলাম।

দেহের পরিবর্তনটা আঙ্গীবুড়ির নজরে পড়েছিল। রধনপুর থেকে আসার পর প্রায় একটা বছর কেটে গেছে। আঙ্গীবুড়ি এমন সময় সন্দেহ প্রকাশ করল। শনিবারে মিলার্ড আসতেই বললাম, দেহটা ভাল যাচ্ছেনা, চল একবার ডাক্তারখানা থেকে আসি।

মিলার্ড চলল আমার সাথে। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলল, ফ্যামিলি ওয়ে।

মিলার্ড গম্ভীর হয়ে গেল।

রাতের বেলায় মিলার্ড বলল, এবার ফর্মাল বিয়েটা দরকার।

বললাম, ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

না, না। সন্তানের পরিচয় চাই। সে পরিচয়ের পথ উন্মুক্ত রাখা প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য।

বললাম, বেশ তাই হবে।

নোটিশ দিতে হবে। কালকেই কাজটা শেষ করে রাখি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় নোটিশ দেবে।

চার্চে।

চার্চে কেন ! আমাদের বিয়ে হবে আদালতে। চার্চে নয়, মসজিদে নয়, মন্দিরে নয়, গুরুদ্বারে নয়। আমরা ধর্মের বাইরে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম নীতির বাইরে, আমরা মানবধর্মী। আমাদের বিবাহ ধর্মের বিবাহ নয়, আইনের বিবাহ।

মিলার্ড বিন্দুমাত্র আপত্তি উত্থাপন করল না। বলল, আগামী সপ্তাহে এসেই নোটিশ দিয়ে আসব দুজনে।

মিলার্ড ফিরে গেল কর্মস্থলে।

উইক এণ্ডে এসেই বলল, প্রস্তুত হয়ে নাও। রেজিস্ট্রারের কাছে যেতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি কেন ?

শুভকাজে তাড়াতাড়ি ভাল। কি জানি কোথায় কোন বাগরা আসে।

গেলাম নোটিশ দিতে। বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফিরে এলাম। এসেই বললাম, এবার তো কোন হাঙ্গামা নেই।

তাই বা কি করে বলি। শুভকার্জটা হয়ে যাক তারপর মতামত দেব।

বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রতি সপ্তাহে মিলার্ড এসে বিয়ের জোগাড়ে লেগে যায়। নেমতন্ন পত্র ছাপানো, মেঠাই মণ্ডার বায়না দেওয়া, শাড়ী জামা কেনা। আরও কত খুঁটিনাটি শেষ করে বিয়ের আগের সপ্তাহে গেল আম্মার কাছে। মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করতে।

মার্মাগোয়াতে থেকে ফিরে আসতেই জানতে চাইলাম আম্মার মতামত।

মিলার্ড হেসে বলল, মা রাজি হয়েছেন। তবে !

তবে কি ?

মা বলছিলেন, বিয়েটা চার্চে হলেই ভাল হত। বললাম, তা হয় না মা। সেও নানা ফাক্‌রা। ব্যাপ্টাইজ কর। আরও কত কি। এর চেয়ে সহজ সরল করে নিয়েছি আমাদের ভবিষ্যত বন্ধনকে। আইন আমাদের সহায় হোক। মা এতে খুশী হলেন না। তবুও আশীর্বাদ করেছেন, বলেছেন, মাই ব্লেসিংগস্‌ আর উইথ ইউ টু অল্‌ওয়েজ।

সোমবার সকালে মিলার্ড ফিরে গেল রধনপুরে। শুক্রবার বিয়ের তারিখ। বৃহস্পতিবার রাতের গাড়িতে আসবে, এই ছিল কথা।

রাতের শেষ গাড়ি চলে গেল, মিলার্ড এল না। সারা রাত জানালায় বসে রইলাম। আঙ্গীবুড়িও জেগে বসে রইল আমার পাশে। রাস্তায় কোন শব্দ হলেই ছুটে নেমে যেতাম সদরে। না, কেউ নয় ! হতাশ হয়ে ফিরে আসতাম।

ভোরের আলো দেখা দিল, দেখা দিল না মিলার্ড।

আটটা না বাজতেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ছুটে গেলাম নীচে। দরজা খুললাম, সামনে রেজিষ্ট্রারের পিওন, বগলে তার খাতা পত্র। হেসে জানাল রেজিষ্ট্রার সাহেব শীগ্‌গীরই আসছেন।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

ছুটে গেলাম।

সামনে দাঁড়িয়ে মেঠাইওলা। পেছনে কুলীর মাথায় টুকরি বোঝাই খাবার। হেসে বলল, আর এক দফা আনতে হবে তাকে।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

ছুটে গেলাম।

সামনে দাঁড়িয়ে মিলার্ডের নিমন্ত্রিত আটজন বন্ধু। হেসে বলল, হোয়ার্ ইজ্ হি?

আমার মুখের দিকে চেয়ে একজন বলল, হ্যাজণ্ট্ কাম্ ইয়েট্।

বসতে দিলাম তাদের।

একজন রেগে বলল, ভেরি সিলি।

তাদের জবাব দেবার আগেই আবার কড়ানাড়ার শব্দ। পাঠালাম রাঘবনকে। সে ফিরে এল রেজিষ্ট্রারকে সাথে নিয়ে।

মিলার্ড কোথায়!

আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। চোখে যেন ঝাপসা দেখছি। স্মরণ-শক্তি যেন লোপ পেতে বসেছে। শেষ অবধি মিলার্ড আমাকে বিট্রে করল না তো। না তা হতেই পারে না। এত আয়োজন, এত ভালবাসা সবই কি মিথ্যা, কখনই মিথ্যা নয়। অন্তরাত্মা সায় দিল না। অসারের মত বসে রইলাম সবার সামনে।

রেজিস্ট্রার কাগজপত্র তৈরী করে তুলে ধরল সামনে। সই করে দিলাম। সাক্ষীরাও সই করে দিল। মিলার্ডের দেখা নাই তখনও। সে সই না করলে আজকের আয়োজন সব পণ্ড। বন্ধু গণেশরাম ঠাট্টা করে বলল, মিলার্ডের নামটা আমিই সহি করে দিই। সে যখন এল না তখন তাকে জব্দ করবার এই একটাই পথ।

সবাই হেসে উঠল।

হাসি থামতে না থামতে আবার কড়ার শব্দ। এবার সবশক্তি নিয়ে ছুটে গেলাম। সামনে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাম পিওন। কম্পিত হস্তে সই করে নিলাম কাগজখানা। খুলে পড়তে পড়তে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম ভূমিতে।

যখন জ্ঞান হল তখন মাথার কাছে বসে আঈবুড়ি বাতাস করছিল। রাঘবন দূরে দাঁড়িয়ে, তার চোখে জল।

তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়লাম। মনে মনে মৃত্যুর কামনা করছিলাম অহরহ কিন্তু আমার মৃত্যু নেই। কলঙ্ক মাথায় নিয়ে বাঁচবার অধিকারটুকু দিয়ে মিলার্ড বিদায় নিয়েছে।

নাজমা বেগমের চোখ দিয়ে অবিরত ধারায় অশ্রুর বন্যা নেমেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, বোম্বের গাড়িতে উঠতে গিয়ে মিলার্ড ট্রেনে কাটা পড়েছিল। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ সে আমাকেই খুঁজেছে। আমার ঠিকানা রেখে গেছে তার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে দিতে।

থামল নাজমা বেগম। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ধরা-ধরা গলায় বলল, তারপর তোমার জন্ম। এণ্ড আই য়্যাম্ ইওর্ ভার্জিন্ মাদার্।

নাজমা বেগম পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

জর্জি বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার মায়ের মুখের দিকে।

॥ ৪ ॥

ঘড়িতে বারটা বাজল।

নাজমা বেগম ডাকল, জর্জি।

মা!

আজকের মত শুয়ে পড়। আবার কাল বলব। মাই সন্, ফরগিভ্ এণ্ড ফরগেট্। মাদার ইজ্ মাদার এণ্ড অলওয়েজ হলি।

জর্জি মাথা নীচু করে বসে রইল। কোন জবাব দিতে পারল না।

কি ভাবছ জর্জি?

সো পেন্‌ফুল!

তার চেয়ে পেন্‌ফুল বাঁচার চেষ্টা। আমার বয়স সতের আঠার। কোলে তুমি। মনে হল সেই অমর কথা, আই লিভ ফর দি। তাই বাঁচবার চেষ্টা শুরু হল। অভিভাবক বলতে ঐ আঈবুড়ি, শুভানুধ্যায়ী বলতে ঐ রাঘবন। ঘরে টাকা নেই, আহার্য নেই। গরীবের মেয়ে ছিলুম, টাকার অভাবকে ভয় করিনি কখনও, তবুও ভীত হলাম কি করে তোমায় বড় করব তাই ভেবে ভেবে। মিলার্ড যা পাঠাতো তাতে সংসার চালিয়েও কিছু হাতে থাকত। তাও অতি সামান্য। সেই সামান্য অর্থ দিয়ে কয়েক মাস চালিয়ে নিলাম। তারপর এল দারিদ্রের বিভীষিকা। চাকরির সন্ধানে ঘুরতে থাকি।

মিলার্ড বলেছিল, তোমাকে লেখা পড়া শিখিয়েছি তোমার ভবিষ্যতের জন্য।

তোমাকে গান শিখিয়েছি তোমার তুর্দিনের জন্য। মিলার্ডের কথা স্মরণ করেই ঘুরতে থাকি পথে পথে। একদিন জুটল একটা চাকরি। ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাষ্টারী। বেতন যা পেতুম তা দিয়ে বাড়ি ভাড়া দেবার পর সামান্যই থাকত তিনজনের পেট ভরাতে।

বাকিটুকুর দায়িত্ব নিল রাঘবন। আমার কাছ থেকে সাতটি টাকা নিয়ে রাঘবন সবজির দোকান করল বাজারে। তার উপার্জনে আহার্য সংস্থান হচ্ছিল কোন রকমে।

আঙ্গবুড়িও কম নয়। সে রাতের বেলায় বসে বসে কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী করত। সেগুলো বিক্রি করে তোমার তুধের দাম দিত।

জর্জি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, বলল, থামো মা তুমি থামো আর শুনতে চাই না।

নাজমা মৃত্ন হেসে বলল, হ্যাভ্ পেশান্স্। সহনশীল হও বাবা। সহন শীলতাই মানুষকে বড় করে। ধৈর্ষ যদি হারাতাম সেদিন তাহলে আজ আমার ও তোমার স্থান কোথায় হত তা তুমি কল্পনাও করতে পারনা।

কেটে গেল একটা বছর।

তুমি আধো আধো কথা বলতে, হাসতে, খেলতে। আমার অপূর্ণ জীবনের সাধ যেন পূর্ণ হত তাতেই।

একদিন এল সেই বুড়ো ওস্তাদ।

বলল, জলসায় গান গাইবি বেটি?

আমি তো ভাল গান জানি না বাপুজি। পারব কি?

কেন পারবি না বেটি। আমি তোর পাশে থাকব। ডরাস না।

রাজি হতে পারছিলাম না। ওস্তাদের পীড়াপীড়িতে রাজি হলাম।

নির্দিষ্ট দিনে ওস্তাদ এল গাড়ি নিয়ে। আঙ্গবুড়ির কাছে তোমাকে রেখে রাঘবনকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম জলসায়।

ষ্টেজে উঠেই ঘাবড়ে গেলাম। সামনে বসে রয়েছে কয়েক হাজার শ্রোতা। সবাইয়ের দৃষ্টি যেন আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। ওস্তাদকে বললাম, বাপুজি আমাকে ক্ষমা করুন।

ভয় নেই বেটি। পহেলাবার ওমনি ঘাবড়ে যায় অনেকেই। নে যন্তর হাতে তুলে নে।

নিলাম তুলে এসরাজ। হাত কাঁপতে লাগল। এসরাজের ছড় যেন ভিন্ন গৎ গেয়ে চলল। রেখে দিলাম এসরাজ, টেনে নিলাম সেতার।

দেহের কাঁপুনি তখন শুরু হয়েছে। গলার শব্দ তখন প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়, কাঁপুনি ভরা গলায় সুর তুললাম।

যখন গান শেষ হল তখন তাকিয়ে দেখি শ্রোতারা নীরবে বসে তারিফ করছে।

ওস্তাদ পিঠ চাপড়ে বলল, সাবাস্ বেটি। এমন গান অনেক কাল আমরা শুনিনি। কামাল কর্ দিয়া হামারা বেটি।

আসর থেকে ধীরে ধীরে উঠে এসে গাড়িতে বসলাম।

উদ্যোক্তরা একখানা খাম এনে হাতে দিয়ে নমস্কার করল। আমিও বিনিময়ে নমস্কার করে ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়।

খাম খুলে পেলাম একশত টাকার নোট।

অকল্পনীয় প্রাপ্তি। আর এর মূলে রয়েছে ওস্তাদ। তাকে মনে মনে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এর চারদিন পরের ঘটনা।

দরজায় কড়ানাড়া শুনে নেমে গেল আঙ্গবুড়ি। মিলার্ডের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর দরজার কড়া নাড়লেও আমি কখনও নেমে যেতাম না।

কোন ভদ্রলোক আঙ্গবুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, নাজমা বেগম আছেন।

কেন ?

তার সাথে কথা বলতে চাই।

আঙ্গবুড়ি অসন্তুষ্ট ভাবে বলল, কেন না জানলে কারও সাথে বেগম দেখা করে না।

ভদ্রলোক থতমতো খেয়ে গেল। বলল, একটা জলসার কথা বলতে এসেছি।

বসুন। বলে আঙ্গবুড়ি উঠে এল। আমি নেমে গেলুম নীচে।

নমস্কার !

মুখ তুলে ভদ্রলোককে দেখে নিলুম।

বললাম, নমস্কার। বলুন কি প্রয়োজন।

আমি ওয়ার্ডেন মুভীর মালিক। সেদিন জলসায় আপনার গান শুনেছিলাম। আমার নতুন বইয়ের ক'খানা গান আপনার গলায় শোনাতে চাই শ্রোতাদের।

বিনীত ভাবে বললাম, গান তো আমি ভাল জানি না।

ওটা হল বিনয়ের কথা। আপনার গান যে শোনেনি সে এই কথা বিশ্বাস করবে। আমি নয়। মোট ছ'খানা গান গাইতে হবে। আমি কণ্ট্রাক্ট করতে রাজি।

বললাম, মাপ করুন।

কেন বলুন তো। আপনার বাবা অথবা স্বামীর আপত্তি আছে কি ? আপনি তো সিনেমায় অভিনয় করবেন না। আপনার গলার শব্দটা শুধু রেকর্ড করা হবে। এর জন্য যা পারিশ্রমিক চান তা দেব।

আজ আপনাকে বলতে পারছিনা। কাল একবার আসবেন। তখন আপনাকে ফাইন্যাল মতামত দেব।

ভদ্রলোক বিষণ্ণভাবেই ফিরে গেলেন।

পরের দিন আবার এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, মন স্থির করেছেন ?

না।

সে কি ! আমি সবাইকে বলেছি, আর আপনি বলছেন না। লোকে বলবে ঘোরপোরওয়ালা শূন্যে সৌধ নির্মাণ করে, তা হতে দেব না। আপনি দয়া করে মত দিন। আমার ইজ্জত রক্ষা হোক, আপনার সুনামও ছড়িয়ে পড়ুক।

ঘোরপোরওয়ালা এগ্রিমেন্টের কাগজ সামনে তুলে ধরল। মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। বললাম, বেশ তবে একমাসের মধ্যেই গান রেকর্ড করা শেষ করতে হবে।

ঘোরপোরওয়ালা যেন হাতে চাঁদ পেল। কলম বের করে বলল, আপনার নাম ?

বললাম, নাজমা ফ্রাংকাইন।

স্বামী অথবা পিতার নাম !

সাইদা সেদিন থেকে পুরোপুরি নাজমা বেগমে রূপান্তরিত হল। শুরু হল তার জীবনের তৃতীয় পর্যায়।

দলিল সই করতেই ঘোরপোরওয়ালা নগদ দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বাকি দেড় হাজার আগামী মাসে দেবার চুক্তি করে ফিরে গেল।

সেই দিন বোধহয় সবচেয়ে বেশী অনুভব করেছি, মিলার্ড আমাকে কত বেশী ভালবাসত, কত বেশী চিন্তা করত আমার ভবিষ্যতের। মিলার্ডকে অন্তরের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে তার আত্মার মঙ্গল কামনা করলাম। ছুটে গিয়ে বুকে তুলে নিলাম আমার ছোট মিলার্ডকে। এই টুকুই রয়েছে মিলার্ডের স্মৃতি।

তারপর থেকে ছুটে চলছে অর্থের জোয়ার।

নাজমা বেগম পরিচিত হয়েছে জনারণ্যে।

একদিন চুপি চুপি তোকে বুকে করে ছুটে গেলাম আম্মার কাছে। পুত্রশোকে বৃদ্ধা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তখন। ভাল করে চিনতে পারল না।

জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে !

আমি সাইদা। মিলার্ডের বিধবা, আপনার পুত্রবধূ।

হাত দিয়ে আমার মুখ তুলে ধরে চুপ করে বসে রইল।

তোমার কোলে কে ?

আপনার নাতি মিলার্ডের ছেলে।

চিনেছি। চিনেছি। গ্লোরিয়াস হিদেন। মিলার্ড নেই, তার স্মৃতি রয়েছে। যত্ন করিস বাপু। আমার বংশধর।

বুড়ি আম্মা ঝিমিয়ে পড়ল।

তারপর বেশিদিন আম্মা বাঁচেনি। শেষ বেলায় তার সাথে দেখাও হয় নি। আমি ভেবেছিলাম আম্মাকে নিয়ে আসব আমার কাছে। আম্মা রাজি হয় নি। হিন্দুর কুসংস্কার তার ছিল। স্বামীর গৃহ ছাড়তে সে চায়নি। স্বামীর গৃহেই সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। শান্তি পেলেই আমার আনন্দ।

এসেছিলাম হায়দ্রাবাদে গানের মজুরা করতে।

শহর আমাকে মুগ্ধ করেছিল, ইচ্ছা ছিল হায়দ্রাবাদেই বাস করি। পেয়ে গেলাম সস্তায় এই বাড়িখানা। কিনে ফেললাম। বাস করছি এখানেই গত পনরটা বছর।

হায়দ্রাবাদে যে বছর এলাম সে বছরে কুড়িয়ে পেলাম জিজাকে। হাসপাতালে ওর বাবা মা মারা যায়, আত্মীয়রা ওকে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। আমি নিয়ে এলাম ওকে। তোর সাথে খেলবার একজন সাথী মনে করেই এনেছিলাম। হঠাৎ প্ল্যান প্রোগ্রাম বদল করতে হল।

রাঘবন আমার সব চেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। সে বলল, বাঈ, জর্জিকে বিদেশে পাঠাও লেখাপড়া শিখতে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেনরে ?

এখানে জর্জি মানুষ হবে না। তোমার গান বাজনার আসরে কারও লেখাপড়া হতেই পারে না। দূরে থাকলে মানুষ হবে, বাপের নাম রক্ষা করবে। ওকে কোথাও পাঠিয়ে দাও। বোর্ডিং-এ থেকে লেখাপড়া শিখুক।

রাঘবনের মতামতকে মূল্য দিয়েছি চিরটা কাল। সে আমার ও তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। সেও চায় তুমি মানুষের মতো মানুষ হও, আমিও চাই। সারা রাত ধরে রাঘবনের কথা ভেবে দেখলাম। কিন্তু কতদিন তোকে দূরে রেখে দেব, একদিন তোরও তো জানতে ইচ্ছা হবে তোর পিতা মাতার পরিচয়। সেদিন এই ব্যবস্থা দিয়ে যা গোপন করতে চেয়েছি তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে তোর চোখের সামনে। ঘৃণা করবি নিজের মাকে, নিজের পিতাকে। তুই যদি না বুঝিস তোর জন্যই তোর মাকে গায়িকার বৃত্তি নিতে হয়েছে, তোর জন্যই অভিনয় হয়েছে তোর মায়ের জীবিকা, তোরই মঙ্গল কামনা করেই তোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বহুদূরে ; মিলার্ডের স্বপ্ন

সেদিন ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। সন্তান হয়ত নেমে যাবে কলঙ্কিত জীবন-পথে। সেদিন সন্তান হারাবে আদর্শ আর আমি হারাব সারা জীবনের সাধনা।

ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

পরদিন রাঘবনকে ডেকে আবার পরামর্শ করলাম। আবার অস্থির চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলাম। কিন্তু কোন সমাধানে আসতে পারলাম না।

ছ' বছরের জর্জি সেদিন যদি জিজ্ঞাসা না করত, মা তুমি কোথায় যাচ্ছ, কেন আমাকে সঙ্গে নিচ্ছ না, তাহলে তোকে বুকে চেপেই রাখতাম। সন্তানকে কৈফিয়ত দিতে হবে এতো স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই দিনই মন স্থির করলাম, জর্জিকে বিদেশেই পাঠাব। সেখানে সে লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, মানুষ হবে। এই অবসরে আমিও বিদায় নেব, আমিও ফিরে আসব মাতৃত্বের আঁচলে সন্তানকে জাপটে ধরতে। সেদিন মা ফিরে পাবে সন্তানকে, আর সন্তান ফিরে পাবে মাকে।

বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল নাজমা বেগম।

জর্জি অভিভূতের মত বসে থাকতে থাকতে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলছিল। সে ডাকল, মা!

নাজমা বেগম সামলে নিল নিজেকে।

চোখ মুছে বলল, তাই মাতৃত্বকে নিষ্ঠুরতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। সে নিষ্ঠুরতা মায়ের বুকে কি ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তা তোকে খুলে বলতে পারব না। সে যে কি অসহ্য বেদনা তা মা ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পারবে না। ওরে জর্জি, তোর মুখ চেয়েই আমি বেঁচে রয়েছি। তোর শিশুকালের ছবিটাকে সাজিয়েছি, যেমন জীবন্ত সন্তানকে আদর করে তেমনি করে তোর ছবিটাকে আদর করেছি। তোকে বড় করব বলেই তো নিজেকে ছোট করতে পেরেছি।

আবেগের আতিশয্যে মায়ের পায়ে মুখ রেখে কেঁদে উঠল জর্জি।

সযত্নে জর্জিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে নাজমা করুণ কণ্ঠে বলল, বোধহয় হল না। বোধহয় আমার সাধ পূর্ণ হল না, বোধহয় মিলার্ডের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলাম না। হার মেনেছি নিজের কাছেই। সন্তানের কাছে পরাজয় ঘটেছে মায়ের। মাতৃত্বকে বধ করেও নারীত্বকে রক্ষা করতে বুঝি পরিনি। দি রিটার্ন ইজ, আই মে লুজ মাই সন্।

গম্ভীর হয়ে গেল নাজমা বেগম।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে।

জর্জির হাত ধরে টলতে টলতে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, যখন মার্মাগোয়া থেকে এখানে এসেছিলাম তখন মিলার্ডের একখানা ফটো নিয়ে এসেছিলাম তোমার ঠাকুমার কাছ থেকে।

পর্দা সরিয়ে আলো জ্বালাল নাজমা বেগম। দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি বাড়িয়ে বলল, দিস্ ইজ ইওর ফাদার মিলার্ড।

পূর্ণ আবেক্ষ একটি তৈলচিত্রের সামনে ততক্ষণে জর্জি হাঁটু গেড়ে বসেছে অবনত মস্তকে।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল নাজমা বেগম।

॥ ৫ ॥

তোমার চোখ দুটো লাল কেন জর্জি ?—সকাল বেলায় প্রশ্ন করল জিজা।

কি কৈফিয়ত দেবে ভেবে পেল না।

কথা বলছ না কেন ? অনুযোগ করল জিজা।

কাল রাতে ঘুম হয়নি। মৃদুস্বরে জবাব দিল জর্জি।

জেগে বসেছিলে বুঝি। কেন ?

সে কথা বলতে পারব না।

আমাকেও না ? জিজার কণ্ঠে অনুযোগের স্বর।

জর্জি অবাক হয়ে গেল জিজার কথা শুনে। এতটা হৃদ্যতা সে আশা করেনি।

বল না। বলবে না ?

বলব। আজ নয়।

জিজা গম্ভীর মুখে ফিরে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ ?

দেখি। মা বোধ হয় ব্যস্ত হয়েছেন, সকাল বেলায় তার সামনে একবার হাজিরা না দিলে মা খুবই অসন্তুষ্ট হন। তার কাছেই যাব। তোমার পরীক্ষার ফল কবে বের হবে জর্জি ?

সময় তো হয়েছে।

বড়ই ছাড়া ছাড়া তোমার কথা। সেদিন সেই সিনেমা দেখে আসা অবধি তুমি আমার সঙ্গে কথাই তো বলছ না। কেন বলত ! আমার কি দোষ হয়েছে বল !

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল জর্জির ঠোঁটে। বলল, বলবার মত সময় হয়নি জিজা। যে দিন সময় হবে সেদিন জিজ্ঞাসা করতে হবে না, আমি-ই তোমাকে ডেকে বলব।

জিজা নিজের কাজে ফিরে চলল।

বিকেল বেলায় একখানা চিঠি হাতে করে জিজা এসে দাঁড়াল জর্জির সামনে।

কার চিঠি ? জিজ্ঞাসা করল জর্জি।

মায়ের, মিশন থেকে এসেছে।

ওঃ বলে জর্জি চুপ করে রইল।

খুলবে ?

মায়ের চিঠি মাকেই দাও।

বেশ ! তুমি খুলতে ভয় পাচ্ছ, আমিই খুলছি। বলেই জিজা খামখানা ছিঁড়ে ফেলল। ছোট্ট চিঠিখানা পড়তে বিশেষ সময় দরকার না হলেও পড়াশেষ করেই জিজার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জর্জি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি লিখেছে ফাদার ?

আমাকে যদি ঘুঁষ দাও তা হলে বলব।

বলই না।

বলবার মত সময় হয় নি। সময় হলেই বলব।

গম্ভীর হয়ে গেল জর্জি।

জিজাও গম্ভীর ভাবে বলল, গোপন খবরটা দেব অবশ্য যদি কিছু আমাকে দাও তবেই।

কি চাও ?

কি দেবে ?

দশটা টাকা।

উহুঁ। দশ টাকার সংবাদ এটা নয়। আর টাকা দিয়ে আমি কি করব।

তা হলে কি চাও ! অনর্থক বিলম্ব করছ কেন, বলই না কি আছে। তুমি যা চাইবে তাই দেব। বল জিজা।

যা চাইব তাই দেবে ?

সত্যিই দেব।

বেশ ! ফাদার থমাস লিখেছে, তুমি সিনীয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেছ এবং প্রথম বিভাগে।

আনন্দে উৎফুল্ল জর্জি। লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে জিজাকে জাপটে ধরে বলল, সত্যি !

ধাক্কা দিয়ে জর্জিকে সরিয়ে দিয়ে জিজা বলল, ছিঃ।

থমকে গেল জর্জি, আনন্দপ্রবাহে বাধা পড়ল। অচিরেই বুঝল, আনন্দের

আতিশয্যে যা করেছে তা মোটেই শোভনীয় হয় নি। সুসংবাদ কেমন তিক্ত হয়ে উঠল। বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বলল, মাপ কর।

উচ্চকণ্ঠে হেসে জিজা বলল, নেভার। তারপরই দ্রুতপদে ছুটলো বেগম নাজমার ঘরে। পিছু পিছু ছুটল জর্জি। আমি পাশ করেছি, বলেই মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেগম নাজমাও আবেগের আতিশয্যে জর্জিকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে ফেলল।

আদেশ জারী হল উৎসবের।

জর্জি চিঠি লিখল রেলিকে, ম্যাথুসকে আর লিখল গুণবতীকে।

উত্তর এল সবার কাছ থেকে। অভিনন্দন জানিয়েছে রেলি, সে জানিয়েছে তার সাফল্যের কথা। অবশ্য সে সাফল্যের কোন গৌরব নেই তাও সে জানিয়েছে। মেরী জানিয়েছে তার সাফল্যের কথা।

জ্যাকোবাইন লিখেছে খোলা পোষ্টকার্ডে: তুমি চলে যাবার পরই সব ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়েছে ও হচ্ছে। রেলি আর মেরী তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আমিও। আমার চোখ দুটো তোমাকেই খুঁজে বেড়ায়। তোমার সাহচর্য তোমার সাফল্যের পরিপূরক হোক। রেলি ও মেরী মাঙ্গালোর যাচ্ছে, সেখানেই ওরা থাকবে, কলেজে পড়বে। পড়া যে এগোবে না তাও জানি, তবুও তাদের সাফল্য কামনা করি।

নাজমা বেগম পত্রখানা পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, জ্যাকোবাইন কে?

জর্জি পরিচয় গোপন করেনি, কিন্তু জ্যাকোবাইনের সাথে তার যে অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে তাও বলেনি। জর্জি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হল, কেননা, জ্যাকোবাইনের পত্রের অর্থ সাধারণ চোখে সামান্য হলেও তার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর অর্থ। যার মূল উদ্দেশ্য হল পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া। জর্জির মনে হতে থাকে, মায়ের সম্মুখে মুখ উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার সে হারিয়েছে, পিতা মিলার্ডের স্বপ্ন সে চুরমার করে দিয়েছে। সে অপরাধী, এই অপরাধের কলঙ্ক দেহে জড়িয়ে জিজার সামনে দাঁড়াতেও সে কুণ্ঠিত। অনুশোচনায় সে পুড়ে মরতে থাকে অন্তরে অন্তরে।

জর্জি নিজের ঘরে আত্মগোপন করতে চায়। এ আত্মগোপন উটপাখীর মত আত্মগোপন। কারও পদশব্দ শুনতে পেলে শঙ্কিত হয়ে ওঠে সে, মুখ শুকিয়ে যায়, চোখে ফুটে ওঠে বিপন্নের লক্ষণ।

কদিন ধরে নাজমাবেগম জর্জিকে ডেকেও পায়নি। জর্জির ঘরে এসে দেখেছে কেমন উদাস ধ্যানগম্ভীর চিন্তারেখা জর্জির মুখেচোখে। নাজমার বুঝতে বিলম্ব ঘটল না। কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে যার প্রত্যক্ষ ফল দেখা দিয়েছে তার

সন্তানের মুখে। নাজমা চিন্তিত হল। অনেক ভেবেচিন্তে মাঝরাতে ডেকে পাঠাল জর্জিকে তার ঘরে।

বস জর্জি। পরীক্ষার ফল তো ভালই হয়েছে। এবার কি করবে স্থির করেছ?

বিনীতভাবে বলল, তুমি যা বলবে।

যখন ছোট ছিলে তখন আমি আমার কথা বলতাম। এখন তুমি যথেষ্ট বড় হয়েছে। এখন তোমার মতামতকে সম্মান দেখানো আমার কর্তব্য।

বড় হয়েছি! বলেই চমকে উঠল জর্জি। পাংশু হয়ে গেল তার মুখমণ্ডল। এই ভাবান্তর নাজমা বেগমের দৃষ্টি এড়াল না। সে বুঝল কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। গম্ভীরভাবে ডাকল, জর্জি।

মা।

কদিন থেকে লক্ষ্য করছি তোমার ভাবান্তর। তোমার কি হয়েছে?

কিছু তো হয়নি।

হয়েছে। মায়ের কাছে মিথ্যা বলা মহাপাপ। মাই সন্ রিফ্রেন্ ফ্রম্ সিন্। মায়ের কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তুমি গোপন কর না।

আমাকে ক্ষমা কর। আমি বলতে পারব না।

তোমাকে বলতেই হবে। গুরুতর অপরাধ করলেও তা বলতে হবে। রিপেন্ট মাই সন্, দ্যাটস্ অল্। তাহলেই শান্তি পাবে। বল কি হয়েছে।

জর্জি নীরব।

নাজমা উত্তেজিতভাবে বলল, বল। তুমি যেদিন অভিযোগ করলে মায়ের স্নেহের বিরুদ্ধে সেদিন আমিও বলেছি তোমাকে, কেন নিষ্ঠুর হয়েছিলাম। যে কথা মা সহজে সন্তানকে বলতে চায় না, তাই বলেছি। কেননা আমার নিষ্ঠুরতার স্বপক্ষে যুক্তি না থাকলে সন্তানের কাছে ছোট হয়ে যেতাম। আজও তেমনিভাবে অকপটে তোমাকে বলতে হবে।

জর্জি কেঁপে উঠল। আর্তস্বরে বলল, মা।

হাঁ বেটা। আজ আমাদের মাঝে কেউ নেই। মা আর ছেলে। আমাদের দুর্ভাগ্যময় জীবনের সাক্ষ্য সেই জোভ্। তাকে স্মরণ করে বল কি হয়েছে।

একটা বাজল দেওয়াল ঘড়িতে।

দুটো বাজল।

পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে নাজমা বেগম। বিচারকের আসনে সে, সামনে অভিযুক্ত পুত্র স্বীয় অপকর্মের জবানবন্দী দিচ্ছে। বলা শেষ করে জর্জি মাথা নীচু করে বসে রইল, টপ্-টপ্ করে জল পড়তে থাকে তার দুচোখ দিয়ে।

কথা বলল নাজমা বেগম। এতক্ষণ সে ছিল শ্রোতা।

এই দুর্বলতাকে তুমি জয় করতে পেরেছ কি? পারবে কি?

পারব।

নাজমা বেগম আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে জর্জিকে ফিরে যেতে বলল। জর্জিও মায়ের কাছে সব কথা বলতে পেরে যেন হাল্কা হল অনেকটা। মনের অর্ধেক ক্লেদ যেন ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে গেল।

সকাল বেলায় নাজমা বেগম জিজাকে ডেকে পাঠাল।

জিজা আসতেই তাকে পাশে বসিয়ে বলল, বড়ই রোগা মনে হচ্ছে তোকে। আজকাল কি করিস? সারাদিন বুঝি দৌড়াদৌড়ি করিস, সময় মত স্নান খাওয়াও করিস না। বল না কি হয়েছে!

কিছুতো হয় নি মা। জিজা অবাক হয়ে উত্তর দিল। নাজমা বেগম কেন যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে তা মোটেই সে বুঝতে পারে নি। তার দৈহিক কুশল সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করাতে কেমন যেন অদ্ভুদ মনে হল তার।

নাজমাবেগম হেসে বলল, ছোটবেলার কথা তোর মনে পড়ে জিজা?

খুব!

মোটেই নয়। জানিস তোর বাবা কে ছিলেন?

জিজার চঞ্চলতা নিমেষে অন্তর্হিত হল।

তোর বাবা আর মায়ের একই দিনে কলেরা হয়েছিল। তখন তোর বয়স দুই পুরো হয় নি। কলেরায় তোর বাবা আর মা দুজনেই মারা যান। তোর কোন নিকট আত্মীয় না থাকায় তোকে পাঠান হয়েছিল অনাথ আশ্রমে। সেখান থেকে আমি তোকে নিয়ে এসেছিলাম।

এই কথা বলতে বুঝি ডেকে এনেছ? একথা অনেকবার আঈবুড়ির কাছে শুনেছি।

এই কথা বলতে ডাকিনি। ডেকেছি অন্য কারণে।

সেই কথাই বল। ওসব শুনতে ভাল লাগে না। জ্ঞান হয়ে কখনও বাবা মাকে দেখিনি, কোন আত্মীয়স্বজনের নাম শুনিনি। ছোটবেলা থেকে তোমাকেই বাবা-মা মনে করেছি। তার বেশি আমার দরকার নেই।

তোকে কেন এনেছিলাম জানিস!

কতকটা আন্দাজ করতে পারি।

তা ভাল, এনেছিলাম জর্জির সাথে খেলা করবার একটা সঙ্গী দরকার ছিল। তারপর জর্জিকে মিশনে পাঠিয়ে দিয়ে তোর মুখে 'মা'—ডাক শুনে জর্জিকে দূরে রাখবার দুঃখ লাঘব করতাম।

জিজা অভিমানের স্বরে বলল, তাহলে যা কিছু করেছ তা তোমার নিজের স্বার্থে, আমার স্বার্থে নয়।

অনেকটা তাই। তবে তোকে উপযুক্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছি, তোকেও হোষ্টেলে রেখে পড়িয়েছি। আমার স্বার্থে নয়, তোর ভবিষ্যত গড়ে দিতে। আমার স্বামী মিলার্ডের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম। সে বলত, সব কিছু তোমাকে পরিত্যাগ করবে, বিদ্যা ও জ্ঞান তোমাকে পরিত্যাগ করবে না। আর তার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম বলেই তার অবর্তমানে আমি নিজেকে চালিয়ে নিতে পেরেছিঁ। তোকেও সেই কারণেই লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছি। জর্জিকে মিশনে পাঠালেও তোকে মিশনে পাঠাইনি, কেননা কৃশ্চান ভাবধারায় তোকে বড় করতে চাইনি, কারণ, ভবিষ্যতে কোন অশান্তি দেখা দিলে আমাকে তুই দোষী সাব্যস্ত করতে পারিস। সে সুযোগ আমি দিতে চাই না।

বাধা দিয়ে জিজা বলল, হয়েছে, হয়েছে। এখন তুমি কি বলবে বল। ওসব পুরানো কথা শুনতে চাই না, চাই না।

নাজমা হেসে বলল, বেটি যে বড় হয়েছে সে কথা বেটি যেন ভুলেই গেছে। বলেইছি তো তোকে এনেছিলাম জর্জির সঙ্গীর দরকার ছিল বলে। আজ মনে হচ্ছে জর্জির সঙ্গীর দরকার আজও শেষ হয়নি। তোকে ওর সঙ্গী হয়ে থাকতে হবে। অবশ্য এটা আমার ইচ্ছা।

নাজমার বক্তব্য মোটামুটি স্পষ্ট। জিজার মুখচোখের রঙ্ গেল বদলে। নাজমা বুঝতে পারল তার অবস্থা। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, পারবি মা।

জিজা পায়ের আঙ্গুল কার্পেটে ঘস্‌তে ঘস্‌তে মৃদুস্বরে বলল, হাঁ। বলেই জিজা উঠি-পড়ি করে ছুটে বের হল নাজমার ঘর থেকে।

নাজমা হাসল।

জর্জিকে ডেকেও নাজমা জানাল তার মনের ইচ্ছা। জর্জি আপত্তি জানাতেই নাজমা অতি শান্তগলায় বলল, তোমাকে বোম্বে পাঠাব পড়তে, সেখানে যাবার আগে তোমার বিয়ে দিতে চাই।

কোন প্রয়োজন আছে কি? এত অল্প বয়সে।

প্রয়োজন আছে বহুমুখী। জিজা বড় হয়েছে। তাকে ঘরে রাখা উচিত মনে

করি না ; অথচ তাকে অন্যের ঘরে পাঠাতেও চাই না। আমার ঘর আলো করেই সে থাকবে। তারই জন্য এই ব্যবস্থা। আমার সংসার বুঝে নেবার লোকের দরকার। বাইরের মেয়ে এসে তা পারবে না। জিজাকে তৈরী করেছি আমার মনের মত করে। বুঝলে। আর! আর! মাতৃস্নেহ বঞ্চিত জর্জিকেই বেশি ভেবেছি। তোমাকে মানুষ করতে চেয়েছি, বন্ধন রাখিনি। বন্ধন হল স্নেহ আর ভালবাসা। সেই স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন ছিল না বলেই তোমার পা কাদায় দিতে পেরেছ, বিচারবুদ্ধি তোমার অকেজো হয়ে গিয়েছিল। বন্ধন না দিয়ে যে ভুল করেছি সে ভুল সংশোধন করতে চাই। তাই তোমাকে বন্ধন দিয়ে রাখতে চাই। সন্তান যদি স্নেহের বন্ধনকে ভুল ব্যাখ্যা করে সে সন্তান বহির্মুখী হয়। সে জন্যই এই বিবাহের প্রয়োজন। আই উইস্ ইট্।

সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না জর্জি। মাথা নীচু করে বসে রইল।

তাহলে ব্যবস্থা করি।

একটা দিন আমাকে ভাবতে সময় দাও। কাল উত্তর দেব।

বেশ! আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে হতাশ করবে না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে জর্জির কেমন গুলিয়ে গেল। সামনেই জিজাকে পেয়ে ডাকল, জিজা।

জিজা জর্জির ডাক শুনতে যেন পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে উঠোন পেরিয়ে খিড়কির দিকে যাচ্ছিল।

জর্জি আবার ডাকল, জিজা।

জিজা ফিরল, ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কেন ?

কটা কথা বলতে চাই।

বল।

এখানে নয়, আমার ঘরে চল। সেখানে বসে আলোচনা করব। এস।

জর্জির সাথে জিজা এসে বসল জর্জির ঘরে। বিনা ভূমিকায় জর্জি বলল, আমার মায়ের ইচ্ছা আমার সাথে তোমার বিয়ে হোক।

আমি জানি।

তুমি জান! ভালই হল। কটা কথার জবাব দাও, নইলে আমি কোন জবাব দিতে পারব না মাকে।

আমি জবাব দিয়েছি।

কি দিয়েছ ?

আমি 'হাঁ' বলেছি।

এ বিবাহে তোমার অমত নেই। আশ্চর্য ! তুমি হিন্দুর মেয়ে।

নতুন কথা নয়।

আমি কৃশ্চান।

তার চেয়েও বেশী। তোমার ঠাকুরদা কৃশ্চান ছিলেন, ঠাকুমা ছিলেন হিন্দু। তোমার বাবা হিন্দু-কৃশ্চানের সমন্বয়। আর তোমার মা হলেন মুসলমান। এতে সর্ব ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। এ সব আমার জানা আছে।

এত জেনেও তুমি মত দিয়েছ !

হাঁ।

একটা কথা জান কি ! আমার বাবার সাথে মায়ের কোন সামাজিক বিবাহ ঘটে নি।

তাও জানি। কিন্তু নাজমা বেগম তার স্বামীকে ভালবাসত, এবং ভালবাসে। তাই দ্বিতীয়বার সে বিবাহ করেনি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল জর্জি। মুখরা জিজাকে কিছুতেই সে দ্বিমত করাতে পারবে না বুঝতে পেরে চুপ করে গেল।

জিজা জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি মত ?

আমার মত নেই।

ভাল কথা। আর কাউকে বিয়ে করতে চাও বুঝি।

তাও নয়। অল্প বয়সে বিয়ে করা আমার পছন্দ নয়।

তা বটে। ভাল কথা। একটা প্রতিশ্রুতি মনে আছে ? আমি যা চাইব তাই দেবে বলেছিলে সেদিন। সেই যে পরীক্ষার ফল যেদিন তোমাকে জানিয়েছিলাম। মনে পড়েছে। এবার আমার চাওয়ার পালা। আমি চাই তুমি মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

প্রতিশ্রুতির দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছ, তা করতেই হবে। কিন্তু তুমি জান না আমি কত নীচ, কত ছোট।

সে বিবেচনার ভার মায়ের ওপর ছেড়ে দাও।

জিজা উঠে গেল বাইরে। জর্জি আকাশ পাতাল ভেবে শেষ করতে পারল না। অবশেষে সে স্থির বুঝল এ বিবাহ অনিবার্য। অতএব আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই। শুধু বোম্বেতে পড়তে যাবার ব্যবস্থা পাকা করা প্রয়োজন। মায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে সম্মতি আদায় করল। স্থির হল বিবাহের পরই জর্জি বোম্বে যাবে পড়তে। জিজাও যাবে পুণাতে। কলেজের পড়া উভয়কেই শেষ করতে হবে।

নাজমা বেগম ব্যস্ততার সাথে বিবাহের ব্যবস্থায় মেতে উঠল। পুরুষ চরিত্রের দুর্বলতাগুলো সে ভালই বোঝে, অতএব নিজের সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে বিশেষ সতর্কতার সাথেই সে পা ফেলতে থাকে। ভেতরে ভেতরে যত আয়োজন হচ্ছিল তার বাহিরটা কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। জিজাকে নিয়ে বোম্বে গিয়ে বিবাহের গহনা কাপড় জামা কেনাকাটা শেষ করে এল। বোম্বেতে বাড়ি ভাড়া করে এল। বিবাহকার্যাদি বোম্বেতেই হবে, হায়দ্রাবাদে নয়। জর্জি আর জিজাকে নিয়ে যথা সময়ে বিবাহের নোটিশ দিয়ে এল রেজিস্ট্রারের অফিসে।

নির্দিষ্ট দিনের চারদিন আগে সদলে এল বোম্বেতে।

যতই দিন এগোতে থাকে ততই নাজমা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে। কোন সময়ের জন্যই জিজা আর জর্জিকে বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না। সব সময়ই একটা আশঙ্কা। যতক্ষণ এ বিবাহ সম্পন্ন না হচ্ছে ততক্ষণ সে শান্তি পাচ্ছে না। অতীতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আশঙ্কাকে দৃঢ় করেছে; নিজের জীবনে ছন্দ পতন ঘটেছে বলেই কার্য সমাপন না হওয়া অবধি মনকে প্রবোধ দিতে পারছিল না। শান্তি পাবে কার্য শেষে এ দৃঢ় ধারণা তার মনে।

রাঘবন এসে বলল, বাঈ, প্রীতিভোজের কি করলে?

নাজমা চমকে উঠে বলল, বিয়ে হয়ে যাক তারপর। বোম্বে শহরে খাবারের অভাব নেই, যখন তখন খাবার আনিয়ে সবাইকে খাওয়ানো যেতে পারে।

রাঘবনও আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না। নাজমা বেগমের অমতে সে কিছুই করে না কোন কালেই।

সদরের কড়া নাড়লেই নাজমাবেগম চমকে উঠে। তেলিঙ্গা দারোয়ানকে সদরে বসিয়ে দিল যাতে কেউ কড়া না নাড়ায় সে দিকে লক্ষ রাখতে।

নির্দিষ্ট দিনে রেজিস্ট্রার এসে বিয়ে পাকা করে দেবার পর নাজমাবেগম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাঘবনকে আদেশ দিল প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করতে।

আঈবুড়ি অনুযোগ করল, আগে কেন এটা করলে না সায়দা!

নাজমা কদিন পরে প্রথম হাসল। বলল, তোমার বুঝি মনে নেই। আমার বিয়ের কথা মনে কর দেখি। সবই তো জোগাড় হয়ে ছিল কিন্তু তোমার জামাই আর আসেনি। কড়া নাড়ার শব্দে ছুটে যেতাম, বোকা হয়ে ফিরে আসতাম, সবশেষে এল তার মৃত্যুর খবর। তাই ভয় ছিল আঈ। কোন রকমে বিয়েটা শেষ হলেই আমি সব কিছু করব ঠিক করেছিলাম।

জর্জি জিজ্ঞাসা করেছিল, হোয়াই নট্ ইন্ দি চার্চ?

নাজমা হেসে ছিল।

বিবাহটা হল স্নেহ ভালবাসা আর মনের মিলের প্রতীক। ধর্ম এখানে অবান্তর কথা। যেটা সমাজ গ্রহণ করবে সেটা করাই ভাল মনে করেছিলাম। হিন্দুর মেয়ের সাথে জর্জির বিবাহ হিন্দুমতে হবে অথবা কৃশ্চানমতে হবে তা স্থির করবার দায়িত্ব ছিল আমার। আমি ধর্মের ঐ লেজুড়গুলো ভালবাসি না, তাই আইন তোমাদের ভবিষ্যত গড়তে সাহায্য করুক।

জিজা চেয়েছিল তার বন্ধুদের নেমতন্ন করতে। বিয়ের কার্ড ছাপাতে।

নাজমাবেগম বাধা দিয়ে বলেছিল, বিয়ের পরে।

বিয়ে হয়ে গেছে। এবার উৎসবের পালা। নাজমাবেগম তার সিন্ধুক খুলে দিয়েছে উৎসবকে প্রাণবন্ত করতে। জীবনে সে যা চেয়েও পায়নি তাই পূর্ণ করতে চেয়েছে সন্তানের বিবাহে। নাজমাবেগম মুক্তহস্ত হয়ে উৎসবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে, কোন অপব্যয়ই তার সেদিন অপব্যয় নয়।

নিভৃতে বসে জিজা আর জর্জি নাজমাবেগমের কাজ দেখে ভাবছে। মায়ের এ-পাগলামী কবে শেষ হবে।

বুভুক্ষু নাজমাবেগমকে বুঝতে পেরেছিল রাঘবন আর আঙ্গিবুড়ি।

চার

আজ জাহাজ চলছে উত্তরে। বলে জর্জি থামল।

আমিও এই কথাই বলতে এসেছিলাম। জানতে এসেছিলাম এর পর জাহাজ কোথায় গিয়ে থামবে।

জর্জি বলল, সায়গনে দাঁড়াবার কথা। সেখানে বড়ই গোলমাল। জাহাজ সোজা হংকং গিয়ে নোঙর করবে। গেছ কখনও হংকং-এ? যাওনি। এ বিইটিফুল প্লেস্ ফর দি হ্যাভ্‌স্। এ প্যারাডাইস ফর্ ক্রিমিন্যালস্, এ হেল ফর্ ইউ। থাক ওসব কথা। ছ'দিন ছ'রাত ধরে আমার কাহিনী তো শুনলে, অলমোষ্ট্ অল্ দি এপিসোড্, ওনলি দি কনক্লুশান, কেন আমি সব ছেড়ে এলাম সেইটে বলা বাকি। আজ রাতেই শেষ করব। না রাতে নয়। খেয়েদেয়ে বেলা বারটায় এসো। নট্ ইণ্ডিয়ান টাইম্। ভারতের বারটা মানে এখানে সাতটা, অবশ্য সাতটা বেজে গেছে। সেই বারটায় এস। একটু চা খেয়ে নাও।

জর্জি উঠছিল চায়ের জোগাড়ে। বললাম, আমি চা খেয়ে এসেছি। তুমি যদি খাও তো আনতে বল। আমার দরকার।

হাউ সিলি। চা পেলেই খেতে হয়। কি পাবে জাহাজে। তিন দিন তো বেশ খেয়েছ শাকসব্জী। এ তিন দিনে স্টোর খালি। সামনের তিন দিন শুকনো খাবার। আবার হংকং গেলে তবেই পাবে ফ্রেশ তরিতরকারী। জাহাজ হল ড্রিঙ্কের রাজ্য, য়াদার ছান্ স্যালাইন ওয়াটার। চা খাও, কফি খাও, সাম্পেন খাও, ভেরি চিপ। বন্দরে রাজা থাকে, আইন থাকে। জাহাজ জলে ভাসলে একমাত্র রাজা ক্যাপ্টেন। বুঝলে অমল। তুমি বস। চা আনতে বলি।

জর্জি নেমে গেল নীচের তলায়। বসে বসে ভাবছিলাম জর্জিকে। ধনীর সন্তান, বিয়েও করেছিল অথচ জাহাজে কেন ঘর বেঁধেছে, তাও সে ঘর ঘরনীবিহীন। খালাসী থেকে শুরু করে কাপ্টেন অবধি সবাই বন্দরে নামল মেয়ে সঙ্গী পাবার আশায়, অথচ জর্জি জাহাজ থেকে এক পাও মাটিতে রাখল না! অন্য কোন কারণ না থাকলেও মাটিতে পা দেবার প্রলোভন থাকা উচিত। বছরের পর বছর জাহাজের এই কামরায় বসে সে জীবন কাটাচ্ছে কেমন করে। আমি তো ষোল সতের দিনে হাঁপিয়ে পড়েছি। মাঝে আকিয়াবে আর রেঙ্গুনে আমিও শহর দেখতে নেমেছিলাম, শুধু নামিনি ব্যাঙ্ককে। জর্জির কাহিনী শুনতে শুনতেই ছয়টা দিন কেটে গেছে।

জর্জিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেক চিন্তা করে নাজমা বেগমকে খুঁজে পেয়েছি। হিন্দী ছবির নাজমার গান রাস্তাঘাটে অনেক শুনেছি। হিন্দী ছবি দেখার খুব বেশী সুযোগ পাইনি নইলে নাজমা বেগমের চলাচলের ছবিও হয়ত দেখতে পেতাম।

নাজমার ছেলে জর্জি। তাও একটি মাত্র।

মাঝে মাঝে অবিশ্বাস জন্মালেও ধৈর্য ধরে শুনছিলাম তার কাহিনী।

হঠাৎ জাহাজের হুইশিল মাঝে মাঝে বেজে উঠতে লাগল। এ হল বিপদের সঙ্কেত। চিন্তিত ভাবে কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বহুদূরে ধুঁয়োর মত যেন কি একটা দেখা যাচ্ছিল। খালাসীরা ছোটাছুটি করছিল, জাহাজে নূতন ভাবে চঞ্চলতা দেখা দিল। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। এমন সময় জর্জি এসে ডাকল, এস। চা এসে গেছে।

তার পেছন পেছন কেবিনে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের সঙ্কেত ?

জল স্তম্ভ। জাহাজের খোল বন্ধ করা হচ্ছে। জাহাজের ওপর দিয়ে হয়ত জলের স্রোত বয়ে যাবে। নাও তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ করে নাও। জলস্তম্ভ ছুটে আসবার আগেই কেবিনের দরজা বন্ধ করতে হবে।

আমাকে চিন্তিত দেখে জর্জি বলল, ভয়ের কিছু নেই। বেশতো যাচ্ছি, মাঝে দু একটা গড়ানি দিয়ে ব্যায়াম করে নিতে পারবে। এ রকম জলন্তন্ত অনেক দেখেছি লড়াইও করেছি এর সাথে।

জর্জি চায়ে চুমুক দিল।

জাহাজের হুইশিল বিরামহীন ভাবে বেজে চলল। জর্জি উঠে কেবিনের দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, দ্যাট্ মন্স্টার নিয়ারস্ য়াস্।

তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ শেষ করে নামিয়ে রাখল দেওয়ালের কাছে। আমিও তার দেখাদেখি কাপ নামিয়ে রাখলাম।

এবার বিছানায় সটান শুয়ে পড়।

দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের গায়ে কিসের যেন প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগল। জাহাজ কাত হয়ে গেল। জাহাজের হুইশিল তখন বেজে চলেছে।

তখনি আবার জাহাজ সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবার আরম্ভ হল প্রচণ্ড দোলুনি। যেন নাগরদোলায় উঠেছি। মাথা ঝিম ঝিম্ করতে লাগল, বমি বমি মনে হতে লাগল, পেটের নাড়িভুঁড়ি কেমন মোচড় দিতে থাকে।

জর্জি বলল, ভয় নেই। খাটটা চেপে ধরে থাক। নইলে নীচে পড়ে যাবে, আঘাত পাবে।

জর্জির উপদেশমত আঁকড়ে ধরলাম খাটের বাজু। এই দোলুনি যেন থামতে চায় না। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে অথচ দোলুনি থামেনি।

দোলুনি যখন থামল তখন দেহের আর কিছু নেই। জর্জি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, নাথিং রং।

বললাম, আমার মাথা ঘুরছে উঠতে পারছি না।

তুমি তো অভ্যস্ত নও, শুয়ে থাক। আমি তোমাকে চাঙ্গা করে দিচ্ছি।

জর্জি বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। আমি চোখ বুঁজে শুয়েছিলাম। তার ডাকে তাকিয়ে দেখি এক গ্লাস ভর্তি কোন জলীয় পদার্থ নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। বলল, চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নাও। সুস্থ হবে।

তার উপদেশ মত খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

দশ পনর মিনিট পর নিজেকে সুস্থ মনে হল। উঠে বসলাম।

জর্জি হেসে বলল, অল্ রাইট!

তাই মনে হচ্ছে।

মনে হওয়াটা সব কিছু নয়। আসলে তুমি কেমন আছ তাই বল।

খুব ভাল।

খুব ভাল! বলে জর্জি চুপ করে গেল। কি যেন ভাবল।

কি ভাবছ?

ঐ শব্দ দুটোকে বড়ই ভয়। খুব ভাল শুনলেই আমার পিলে চমকে চায়। জিজাও আমাকে বলেছিল খুব ভাল! কিন্তু খুব ভাল মোটেই নয়। সেটা তার মৌখিক আপ্যায়ন মাত্র। তোমাকে তো বলেইছি আমার বিয়ের কথা। প্রীতি-ভোজের ঘটা দেখে আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। নাজমাবেগমের কিন্তু কোন বিকার নেই। তার সারা জীবনের সাধ পূরণ করল তার ছেলের বিয়ে দিয়ে। প্রীতিভোজও সেই অনুযায়ী বিরাট একটা য়্যাড্ভারটাইজমেণ্ট্।

সবমিটে গেলে মা বলল, জর্জি এবার জিজাকে নিয়ে বেড়িয়ে এস।

কোথায়?

সিমলা। বাড়ি ঠিক করেছি। পিটার সেখানে থাকবে আর আঙ্গী যাবে তোমাদের সাথে। মাত্র পনর দিন, তারপর এসে কলেজে ভর্তি হবে। চেষ্টা করছি যাতে ইন্জিনিয়ারিং কলেজে জায়গা পাও।

সেই রাতেই জিজা প্রথম এল আমার ঘরে। বিয়ের রাত ও পরের দু'রাত জিজা আসেনি। উৎসবের জোগাড়ে সে ব্যস্ত ছিল, আজ বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল তাকে। আমার পাশে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। আমিও সন্তর্পণে উঠে এসে ছাদের আলসেয় বসে রইলাম।

শেষরাতে দেখি জিজা উঠে এসেছে। পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, এখানে কেন বসে আছ?

ঘুম হল না।

বুঝেছি।

কি বুঝেছ?

এ বিয়েতে তোমার মত ছিল না। তাই পালিয়ে বেড়াতে চাও।

না। অমতটা সাময়িক। আরও দু এক বছর পর এ বিয়ে হতে পারত।

দু বছর আগে হয়েই কি তোমার সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

না।

তবে।

শুনে কাজ নেই।

শুনতেই হবে আমাকে। আমি তোমার স্ত্রী। অধিকার রয়েছে শোনবার।

চুপ করে বসে রইলাম।

জিজা গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, বল।

দরকার নেই অশুভ দুষ্ট কথা শুনে।

নিশ্চয়ই দরকার আছে। সারা জীবন একসাথে বাস করতে হবে আর তোমার কথা আমি শুনব না। একি হয়!

পরে শুনো।

না। আজই শুনব। চেপে বসল জিজা আমার পাশে।

অগত্যা রাখাঢাকা করে জ্যাকোবাইনের কথা বললাম তাকে।

নীরবে সে সব ঘটনা শুনল, শুনেই হো-হো করে হেসে উঠল।

হাসছ কেন? মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

মায়ের ঘুম আজ ভাঙ্গবে না। বিশ বাইশ বছর পর আজই বোধহয় তিনি প্রথম নির্ভাবনায় ঘুমিয়েছেন। যাক সে কথা, যা বললে তা আমি জানি।

বিস্মিতভাবে বললাম, তুমি জান।

হাঁ। বিয়ের আগে মা আমাকে বলেছেন। ভবিষ্যতে যদি কখনও কোন সময় পরস্পরের মাঝে সন্দেহের প্রাচীর উঠে দাঁড়ায় সেজন্য মা আমাকে প্রস্তুত করে রেখেছেন।

কথা বলতে পারলাম না। মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

জিজা বলল, এই কারণেই আমাদের বিয়ে দুবছর পরে না দিয়ে দুবছর আগে দিয়েছেন। যে কোন মানুষের অসংযত লোভকে কণ্ট্রোল করতে হলে তার কাঁধে জোয়াল তুলে দিতে হয়। নাজমাবেগম এতে কোন ভুল করেন নি। কোন সময় কোন বিরূপ মনোভাব যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য তিনি তার জীবিকা থেকেও অবসর নিয়েছেন। আজই বিশ হাজার টাকার চুক্তিপত্র রিফিউজ করেছেন। সারা জীবন ধরে তোমার মঙ্গল কামনা করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তোমার ভবিষ্যত চিন্তা করেই তোমার বিবাহ দিয়েছেন। বুঝলে? এখন চল শুয়ে পড়। রাত শেষ হতে চলল।

আমি তার সাথে উঠে এসে বিছানায় বসলাম। বললাম, তবুও তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে!

নিশ্চয়! আই কান্ট্ বিট্রে মাইসেলফ্। তোমার মনটা ভারাক্রান্ত, চল কালকেই সিমলা রওনা হই। নতুন পরিবেশে তোমারও মনের পরির্তন ঘটবে! আমাদেরও নতুন জীবনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটবে।

পরের দিন আঙ্গি-এর পরিচালনায় রওনা হলাম সিমলার পথে। মা এসে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন স্টেশনে।

ট্রেন ছুটছে। বীণা, ঝাঁসি, অবশেষে এল দিল্লীতে।

দিল্লীতে পিটার অপেক্ষা করছিল। তারই ব্যবস্থাপনায় হোটেলে এসে উঠলাম।

দিল্লীতে যে কটা দিন ছিলাম তার স্মৃতি গভীরভাবে মনে দাগ কেটে বসেছিল। ছায়াছবির মত দ্রুত কেটে গিয়েছিল দিনগুলো। আজ লালকেল্লা, কাল কুতুব, পরশু সফদারজং করতে করতে চারটে দিন কেটে গেল। জিজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগছে।

জিজা বলল, খুব ভাল।

কি খুব ভাল। দিল্লী না আমি।

হেসে গড়িয়ে পড়ল জিজা, মুখের সামনে মুখ তুলে বলল, তুই-ই। কিন্তু তোমার কটা ?

এক।

মানে ?

মানে তুমি।

ম্যালের রাস্তায় হোটেল ঠিক করা ছিল। এসে উঠলাম সেখানে। ছুটে ছুটে বেড়ালাম কদিন। দেখতে দেখতে সাতদিন পেরিয়ে গেল। আবার বাঁধাছাদা আরম্ভ করল পিটার। আঙ্গিবুড়ি শীত সহ্য করতে পারছিল না। সেও চায় যত শীগ্‌গীর সম্ভব নীচে নেমে যেতে। জিজা চায় আরও কিছু দিন থাকতে। আমারও বিশেষ অনিচ্ছা ছিল না। আঙ্গিবুড়ির জন্যই নামতে হল নীচে। এবার দিল্লীতে আর ব্রেক জার্নি না করে সোজা রওনা হলাম বোম্বাইয়ের পথে। সিমলা থেকে গেল পেছনে।

পথে জিজাকে বললাম, একটা কাজ করলে কেমন হয় ?

কি কাজ।

আমার বাবা ছিলেন রধনপুরে। মায়ের বাড়িও সেখানে। যাবে একবার সেখানে। চল না দেখে আসি রধনপুর।

মাকে না জিজ্ঞাসা করে যাওয়া কি ভাল হবে।

জিজ্ঞাসা করবার সময় কোথায়। পিটার আর আঙ্গি ফিরে যাক। ওদের কাছেই মা তো সব জানবেন। ভারিতো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। চল না।

জিজা দোমনা হয়ে বলল, বেশ চল।

পিটার আর আঙ্গীকে বলে সব জিনিসপত্র তাদের হেফাজতে দিয়ে শাখা পথের গাড়িতে উঠে বসলাম। দুপুর বেলায় এসে পৌঁছালাম রধনপুরে। স্টেশন থেকে ঠিকা গাড়িতে যাওয়া আসার বন্দোবস্ত করে শহরে গেলাম। খুঁজেপেতে পৌঁছালাম আবগারী অফিসে। জিজ্ঞাকে গাড়িতে বসিয়ে আমি গেলাম অফিসে।

কাকে চান? প্রশ্ন করল পেয়াদা।

এখানে নিয়ামতুল্লা নামে কোন পিওন আছে কি?

নিয়ামতুল্লা! মনে পড়ছে না। আচ্ছা ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখি। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল নিয়ামতুল্লা পিওন অবসর নিয়েছে প্রায় আঠার বছর আগে। বেঁচেই আছে তবে নড়তে চড়তে পারেনা। বেশ বুড়ো হয়ে গেছে সে।

কোথায় আছে সে। জিজ্ঞাসা করতেই ঠিকানা দিল।

ছুটলাম সেখানে।

মাটির খাপড়ার ছোট্ট একখানা ঘরের সামনে খাটিয়া পেতে বসেছিল এক অশীতিপর বৃদ্ধ। শক্ত সামর্থ একজন বৃদ্ধা বসে হুঁকোতে তামাক খাচ্ছিল। গাড়ি থেকে নেমে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে নিয়ামতুল্লা নামে কেউ থাকে?

বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল, বলল, কোথা থেকে আসছ?

বললাম, বোম্বাই থেকে।

আমাদের কথা বৃদ্ধের কানে যেতেই তার গলা দিয়ে ঘর ঘর শব্দ বের হল। জিজ্ঞাসা করল, কে রে হামিদা।

জানি না। তোমাকে খুঁজছে।

আমাকে!

বললাম, হাঁ আপনাকে। আমি বোম্বে থেকে আসছি আপনার সাথে দেখা করতে।

কি কাজ বাবুজি?

সাইদাকে চেনেন?

বৃদ্ধ মনে মনে হিসাব করে বলল, এক সাইদাকে চিনতাম।

জিজ্ঞা জিজ্ঞাসা করল, মিলার্ড নামে আপনার কোন অফিসার ছিল কি?

বৃদ্ধ আবার মনে মনে হিসাব করে বলল, হাঁ, হাঁ। সাহেব তো রেলে কাটা পড়ে মারা গিয়েছে। কিন্তু কেন?

বৃদ্ধা এগিয়ে এল। হুঁকোটা খাটিয়ার সাথে হেলান দিয়ে রাখল।

সাইদা আমার বেটি। ওতো শুনেছি মরে গেছে। আর হাকিম সাহেবও রেলে কাটা পড়েছিল। তাদের খবর কেন বাপজান? হাকিম সাহেব বড়ই ভাল

লোক ছিল। হায়! বেচারা বেঘোরে প্রাণটা দিল। অমন সাহেব আর হয়নি। সবই নসীব বেটা, সবই নসীব।

আমি সাইদার ছেলে। মিলার্ড আমার বাবা।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একই সাথে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল।

সাইদা বেঁচে আছে। এই তোমাদের নাত্‌বউ জিজা।

বেঁচে আছে! বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম, জিজাও কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

বৃদ্ধের দেহে যেন যুবকের শক্তি ফিরে এল। দু'হাত বাড়িয়ে আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে বলল, চোখের রোশনাই কমে গেছে বেটা। তবুও মনে হচ্ছে তুই সাইদার বেটা! সাইদার কাছে নিয়ে যাবি বেটা, একবার তাকে দেখতাম। মাত্র একবার।

বৃদ্ধ আর কিছু বলতে না পেরে অসাড়ের মত হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে বসল।

বৃদ্ধা জিজার মুখখানা ভাল করে তুলে ধরে বলল, গরীবের ঘরে রাজরানী এসেছে। কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! বলতে বলতে জাপটে ধরল জিজাকে। সাইদার বেটার বউ। আহা কি সুন্দর।

ফিরতে হল নিয়ামতুল্লা আর হামিদা বেগমের স্নেহের আবেষ্টনী ছেড়ে। আসবার সময় হামিদার হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বললাম, নানি, তোমাকে কিছুই দিতে পারলাম না, তোমার সেবার জন্য রেখে গেলাম।

বৃদ্ধা কিছুতেই নিতে চায়নি, জোর করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

গাড়িতে বসে জিজা কোন কথাই বলেনি। স্টেশনে এসে বলল, বড়ই দুঃখী। দেখাশোনার করারও কেউ নেই।

বললাম, তা ঠিক। দুঃখী কি আমরাও কম। মায়ের উপার্জিত অর্থ ভোগ করছি। নিজের কি আছে বল। তবে আমাদের দেখাশোনা করবার জন্য মা আছেন এই যা সান্ত্বনা।

জিজা গম্ভীর হয়ে গেল।

বোম্বাই পৌছে মায়ের কাছে যথেষ্ট কৈফিয়ত দিতে হল। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শুনলেন তার বাবা আর মায়ের কথা। কোন মন্তব্য করলেন না। রাঘবনের সাথে পরামর্শ করে তাকে পাঠিয়ে দিলেন রধনপুরে।

রাতের বেলায় জিজা বলল, থানাতে মা একটা বাড়ি কিনেছেন।

বেশ তো।

বললেন তোকে যৌতুক দিলাম জিজা।

বেশ তো।

ঐ বাড়িতে তুমি থাকবে। বোম্বেতে রোজ যাতায়াত করবে, পড়াশোনা করবে আর আমি যাব পুণাতে পড়তে।

বেশ তো।

সবই বেশ। তুমি একা থাকবে কি করে?

কেন মা থাকবেন।

মা হায়দ্রাবাদে চলে যাচ্ছেন।

গম্ভীর ভাবে বললাম, বেশ তো।

সবই বেশ। তোমার সাথে কথাই বলব না।

হেসে বললাম, বেশ তো। একবার চেষ্টা করে দেখ না।

জিজা অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

পরের দিনই মায়ের ফতোয়া পেলাম। জিজার কথাই ঠিক। নতুন বাড়িতে উঠে এলাম আমরা সবাই, সেখান থেকেই যে যার গন্তব্য স্থানে চলে যাব, এই হল স্থির।

রাতের বেলায় মা ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই বললেন, এই বাড়িতেই তোর জন্ম। এই বাড়িতেই মিলার্ডের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলাম, এই বাড়িতেই আমার সারা জীবনের সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল। অনেক দিন থেকে নজর ছিল বাড়িটার উপর। পেয়ে গেলাম সস্তায়, কিনে ফেললাম।

বলতে বলতে মায়ের গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামল।

আমি চুপ করে শুনে এলাম। প্রথম জীবনের স্মৃতিভরা বাড়িটা কেমন মোহ সৃষ্টি করল আমার মনে। জিজাকে বললাম, সে হেসে বলল, আমি জানি!

বেশ তো!

আবার!

কেন বলব না। যা জানা উচিত আমার তা তুমি জানছ সর্বাগ্রে। এর মানে কি?

হিংসে হচ্ছে? তা হলে সারাদিন মায়ের পাশে বসে থাক সব জানতে পারবে। আমি মায়ের কাছে থাকি তাই সব জানতে পারি। তুমি তোমার ঘরে ঘাপটি মেরে থাক তাই জানতে পার না।

মায়ের চেষ্টায় ইনজিনিয়ারিং কলেজে স্থান পেলাম।

নির্দিষ্ট দিনে জিজা চলে গেল তার হোষ্টেলে। মা-ও প্রস্তুত হল হায়দ্রাবাদ যেতে, রইল আঙ্গবুড়ি আর পিটার।

আমি শুধু দর্শক।

মা-ও চলে যাবে কেমন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল।

মাকে বললাম।

মা বললেন, ধৈর্য ধর বেটা। বি ওয়াইজ্‌।

বলতে বলতে থেমে গেল জর্জি ফ্রাংকাইন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। খাবারের সময় পেরিয়ে গেছে। জর্জি বাধা দিয়ে বলল, কোথায় চললে অমল!

স্নান খাওয়া করতে হবে তো।

নিশ্চয়। এখানেই করে নাও। বেলা তো অনেক হয়েছে। এখন হোটেলেও খাবার পাবে কিনা সন্দেহ।

বললাম, তোমার অতিথিপরায়ণতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে আজ মাপ কর। তোমার ডিউটি রাতে, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে স্নান খাওয়া শেষ করে আসছি। তুমিও খেয়ে নাও।

জর্জির কেবিনে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। খোলের রাজ্যেই গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে ছিলাম। পাশে কয়েকজন সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বিশেষ কষ্ট পাচ্ছিল। তারা নোংরা করে তুলেছিল খোলের একটা বৃহৎ অংশ। কোন রকমে নাকে কাপড় চেপে শুয়ে ছিলাম। আমার বিলম্ব দেখে জর্জি নেমে এসেছে নীচে, এসেই ডেকে তুলল।

ওকি! তোমার না আমার ওখানে যাওয়ার কথা!

শরীরটা ভাল নেই।

এই নোংরায় থাকলে শরীর মোটেই ভাল থাকবে না। চল ওপরে। টানতে টানতে নিয়ে চলল।

কেবিনে বসেই বলল, একটু চা হোক।

মন্দ কি।

জর্জি আবার ছুটল নীচে। যথাসময়ে আহার্য পানীয় এনেই জর্জি বলল, কাল হংকং-এ জাহাজ পৌছাবে।

সুখবর।

তার আগেই আমার কাহিনী তোমাকে শোনান শেষ করতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি কিসের।

তাড়াতাড়ি নয়। জাপানী জলে জাহাজ ঢুকলেই কাজ বাড়ে। প্রশান্তসাগর জাপানী দরিয়াতে বড়ই অশান্ত। তখন এলার্ট ডিউটিতে থাকতে হয়। সব সময় তোমার সাথে দেখা নাও হতে পারে। আজ অবধি কাউকে তো মনের কথা বলতে পারিনি। তোমাকেই বলছি। তাও যদি বলা শেষ করতে না পারি! তা হবে কেন। শোন অমল, তুমি তো দেশে ফিরবে?

নিশ্চয়ই।

এক মাসের মধ্যেই!

আশা করছি।

একবার থানায় যেও। বোম্বে পর্যন্ত যেতে হবে না। বিশ মাইল এগিয়ে থানা। সেখানে জিজার সাথে দেখা কর। বলবে, জর্জি ইজ্ রিপেণ্টেড্ বাট্ ডাজ্ণ্ট্ ওয়াণ্ট্ টু গো ব্যাক্।

তার কারণ কি জান? থানায় যখন ছিলাম, কলেজে পড়তাম, তখন হঠাৎ এক শনিবারে জিজা এসে হাজির।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম একাই এসেছ?

আজ্ঞে হাঁ।

নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

চুপ! নিজের বাড়িতে আসব তাতে আবার কারণ অকারণ কি?

মা জানেন?

মোটেই না। মা বোঝেন। ভেবেচিন্তে দেখলাম শনিবারে বেলা তিনটেয় রওনা হলে সাতটার মধ্যে এখানে পৌঁছাব। আবার সোমবার সকাল ছটায় রওনা হলে এগারটায় কলেজ করতে পারব। এত সুবিধা থাকতে কেন পড়ে থাকব হোষ্টেলে।

ভালই। যদি মা জানতে পারেন।

এমন কিছু হাতে মাথা কাটবেন না। খুশীই হবেন।

জিজা আরম্ভ করল আসা যাওয়া। পড়াশোনা মাথায় উঠল। বইয়ে আর মন বসে না। কবে শনিবার আসবে তার চিন্তায় বিভোর থাকতাম। জিজা এলেই বেড়াতে যেতাম, সিনেমা দেখতাম, বীচে বসে থাকতাম।

জিজার পড়াশোনাও তথৈবচ।

এক শনিবার জিজা এল না, এল তার চিঠি।

জিজ্জা লিখেছে তার মাতৃত্ব নিকটবর্তী।

আনন্দিত না হয়ে ভীত হলাম। জিজ্জাকে কোন পত্র দিলাম না। পত্র না পেয়ে জিজ্জা সশরীরে এসে উপস্থিত হল। এসেই জিজ্ঞাসা করল, খুশী হয়েছ ?

কারণ ?

তুমি বাবা হবে।

কথার জবাব দিলাম না।

খুশী হও নি !

খুশী হয়েছি। তবে ভয় করছে।

কেন ?

মা কি মনে করবেন।

মা ভালই মনে করবেন। তোমার আর জিজ্জার সন্তান তার নয়নের মণি হবে। দেখ, সে ছেলেকে তোমা র মা কাছ ছাড়া করবেন না কখনই।

তবুও।

আবার।

এত অল্প বয়সে পিতৃত্ব। কেমন যেন ঠেকছে। মা কি মনে করবেন।

জিজ্জা রেগে উঠল, কেন বাজে কথা বলছ। মা খুশীই হবেন। এ সন্তানই তিনি কামনা করেছেন। জ্যাকোবাইনের সন্তান তো নয় !

জিজ্জা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে যে কটুকথা বলল তা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। সত্যই কোনদিন জ্যাকোবাইনকে তুলনা করে আমাকে আঘাত করতে যে জিজ্জা এগিয়ে আসবে একথা ভাবতে পারিনি। গম্ভীর ভাবে বললাম, কি বলছ জিজ্জা !

ঠিকই বলছি। জ্যাকোবাইনের সন্তান তো জর্জির সন্তান নয়, জিজ্জার সন্তান জর্জির সন্তান।

তা মোটামুটি বিশ্বাস করি।

অবিশ্বাস করবার কারণ ঘটেছে কি ?

মেয়েদের গোপন খবর আমি কি জানি।

কি বললে, সর্পিনীর মত ফুঁসিয়ে উঠল জিজ্জা। অস্থিরভাবে পদচারণা করতে করতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপরই তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল রাস্তায়। ছুটল স্টেশনের দিকে। আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে নামতে না নামতেই পূর্বগামী ট্রেন এসে দাঁড়াল স্টেশনে। আমি যখন স্টেশনে পৌছালাম তখন ট্রেন চলে গেছে, জিজ্জাও স্টেশনে নেই। ফিরে এলাম বাসায়।

কি হতে কি হয়ে গেল ভেবে পেলাম না। ভেবে দেখলাম, সেও তো আমার চরিত্রকে কটাক্ষ করেছে, আমি তার মৃদু প্রত্যুত্তর দিয়েছি। এতে রাগ হওয়া উচিত নয়। আমার ক্ষেত্রে যা সত্য, তার ক্ষেত্রে তাতো নয়। তবে আমি তো তাকে কিছু গোপন করিনি, সে আমাকে আঘাত দেবে না জেনেই বলেছি। যদি আঘাত দেবার ইচ্ছাই তার ছিল তা হলে প্রথমেই সে-বিষয়ে ফয়সালা করা তার উচিত ছিল।

ভেবে চিন্তে দেখলাম অপরাধ তার, আমার নয়। অপরাধ যারই হোক, আমাকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া কি উচিত হয়েছে। নিশ্চয়ই নয়। জিজাকে ক্ষমা করতে পারলাম না। অভিমান কর্তব্যবোধকে হত্যা করল।

ক'দিন পরে মায়ের চিঠি পেলাম। মা জানিয়েছেন, জিজা তার কাছে গেছে। তার সন্তান সম্ভাবনা। পত্রের শেষে পড়াশোনায় ভাল ভাবে মন দিতে বলে জানিয়েছেন জিজার সন্তান সম্ভাবনা কত আনন্দের।

তা হলে জিজাই ঠিক বলেছে।

কিন্তু জিজা কোন পত্রই দেয় নি।

এমনি করতে করতে ছ'টা মাস কেটে গেল। জিজার কাছ থেকে কোন পত্র-ই এল না। মায়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝে পত্র পেতাম। অতি সংক্ষিপ্ত। আমার উত্তর ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। মনে মনে জিজার উপর রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। জিজার ওপর যে অভিমান তা গুরুতর ক্রোধে রূপান্তরিত হল।

সেদিন যদি মাকে লিখতাম সব কথা, তা হলে ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ হত। মনের আক্রোশ তখনও কমেনি তাই মাকে লিখতে পারিনি।

অনেক দিন পর মায়ের চিঠি পেলাম।

সংবাদ শুভ।

একটি পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছে জিজা।

সামনে পরীক্ষা। সেই কৈফিয়ত দিয়ে থানাতেই বসে রইলাম। আশা করছিলাম জিজার আমন্ত্রণ পাব। সে আমন্ত্রণ আজও আসেনি। আমার হায়দ্রাবাদ যাওয়াও হয়নি, পুত্রের মুখও দেখিনি।

এক মাস কেটে গেল। দু'মাস কেটে গেল। অবশেষে অস্থির হয়ে উঠলাম। এই ভাবে জীবন কাটাবার চেয়ে নিজেকে যাচাই করবার আগ্রহ দেখা দিল।

অবশেষে পেলাম জিজার চিঠি। সে লিখেছে : 'ছেলের নাম রেখেছি রঘুপতি দেশপাণ্ডে, আমার বাবার পদবী দিয়েছি তাকে। অবশ্য মা এটা জানেন না।'

কঠিন আঘাত দিয়েছে জিজা। গুরুতর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে সে। নারী চরিত্রের ভয়ঙ্কর রূপফুটে উঠেছে তার ঐ কয়েকটি ছত্রে।

সেদিন আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। ঘুরতে ঘুরতে জাহাজী অফিসে হাজির হলাম। যুদ্ধ থেমে গেছে। সওদাগরী জাহাজ কোম্পানী তখনও ইংরেজদের হাতে। ফ্রাংকাইনের চাকরি সংগ্রহে বিলম্ব ঘটল না। ইংরেজের বড় গুণ তার সমধর্মী হলে সব কাজেই সুযোগ দেয়। সে সুযোগ পেয়েছিলাম।

চাকরি নিয়ে ভেসে পড়লাম সমুদ্রে।

বলেই জর্জি উঠে তার বাক্স খুলল। একটা পুরাতন চিঠির টাইপ করা কপি সামনে ধরে বলল, রওনা হবার আগে এই চিঠিখানা লিখে ডাকে দিয়ে এসেছি। পড়।

পড়লাম চিঠিখানা।

'জর্জি ফ্রাংকাইন নামক একজন দরিদ্র নাবিকের পত্র। পত্রটি সে লিখছে জিজা ফ্রাংকাইনকে। যে জিজা ফ্রাংকাইন একদিন স্বেচ্ছায় জর্জির জীবনের সকল দায় মাথায় তুলে নিয়েছিল সেই জর্জির বিদায় বাণী। ইতিহাস এর স্বাক্ষর বহন করবে, তাই এই পত্র লিখে জর্জি সমুদ্রে ভেসে পড়ল। তার যদি কোন অপরাধ থাকে তা যেন মার্জনা করা হয়।

: মনে পড়ে জিজা, কত রাত আমরা পরস্পরের সান্নিধ্যে কত কথা বলেছি, কত স্বপ্নসৌধ গড়েছি। সে সব কথা আজ আমরা ভুলে গেছি, সে স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে গেছে। হায়রে জীবন! বন্ধন দিয়ে যাকে আপন করতে চেয়েছ তারই বন্ধন নিজের হাতে ছিঁড়ে দিয়ে তাকে পর করেছ। এত সইতে হল!

সামান্য কটা কথা, যা স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে অনাবশ্যক হলেও আলোচনা হয়, তাই নিয়ে তুমি হিংস্র ফণীনীর মত দংশন করেছ আমাকে। আমি বিষ কণ্ঠে নিয়ে মনের জ্বালায় ছুটছি অজানার উদ্দেশ্যে। হয়ত এ জীবনে দেখা হবে না।

আমার জন্মের পূর্বে আমার বাবা মারা গেছেন। পিতৃপরিচয় পেয়েছি মায়ের কাছে। তোমার সন্তানও তার পিতার পরিচয় আশা করবে তোমার কাছে। সেটাই স্বাভাবিক। সংঘাত সৃষ্টি করে তাকে যেন ধাঁধায় ফেল না।

প্রতিশোধ স্পৃহা ভাল কি মন্দ তুমি বিবেচনা করবে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নিজের সন্তানের অমঙ্গল ডেকে এনো না।

যদি কোন দিন ফিরে আসি সেদিন যেন পরিচয় দেবার পথ খোলা থাকে, এই টুকুই প্রার্থনা।'

পড়া শেষ করে চিঠিখানা জর্জিকে ফেরত দিলাম। জর্জি আরেকখানা চিঠির নকল হাতে দিয়ে বলল, মাকে লিখেছিলাম। পড়ে দেখ।

'আমার মা ! আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ তুমি। তোমার কষ্ট বৃদ্ধি করা আমার ধর্মও নয় কর্মও নয়। তবুও তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, সে যে কত বড় দুঃখ তা চিঠি দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

'মানুষ করতে চেয়েছিলে, মানুষ হতে পারিনি। হয়ত পারতাম কিন্তু সামান্য ভুল বোঝাবুঝি থেকে যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে তাকে রোধ করতে পারিনি।

'তুমি যেমন তোমার সন্তানের মঙ্গল কামনায় স্নেহভালবাসাকে হত্যা করে নিষ্ঠুরের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলে ঠিক সেই ভাবেই আমাকেও আমার সন্তানের মঙ্গল চিন্তা করে নিষ্ঠুর হতে হচ্ছে। আমিও পাদপীঠ থেকে বিদায় নিয়ে চলছি অজানা পথে। জানি না কবে ফিরব। তবে রেখে গেলাম আমার সন্তানকে, তাকে কেন্দ্র করে আমার অনুপস্থিতির দুঃখ ভুলতে চেষ্টা কর।

অপরাধ মার্জনা কর।'

জর্জি আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, হেয়ার এণ্ডস্ দি ম্যাটার্। 'তারপর সুদীর্ঘ পনর বছর ধরে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। সমুদ্র আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। সমুদ্রকে ভালবেসেছি, এ ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করতে পারছি না। ইয়েট, পেন্‌ফুল্ !

জর্জি থেমে গেল।

এতদিন আমি ছিলাম নীরব শ্রোতা। আজ প্রথম কথা বলতে বাধ্য হলাম; বললাম, তুমি মোটেই ভাল করনি জর্জি।

হোয়াট্, চমকে উঠল জর্জি।

তোমার জীবনধারা সমর্থনযোগ্য নয়।

বিশেষ ক্ষুণ্নভাবে জর্জি বলল, আমি জানি, আমি বুঝি, আমি অনুধাবন করি, কিন্তু আজ কেউ নেই যে এই ভুলের মীমাংসা করে দেয়।

তোমার মা।

মা আছেন। কিন্তু তিনি তো আমার ঠিকানা জানেন না। জানলে ঠিক খুঁজে বের করতে পারেন না। তাই ভুল সংশোধন সম্ভব হয় নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জর্জি।

জীবনে একবার পাপের পথে পা দিয়েছি, একবার ভুল করেছি। এ দুটো থেকে মুক্তি পাইনি, কেননা, আই য়্যাম এ স্কাউণ্ড্রেল, আই য়্যাম মীন্ এণ্ড বোগাস্।

কেবিনের দরজা ধরে জর্জি কাঁপতে থাকে। তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, এখনও পথ আছে।

পথ আছে? সত্যিই আছে!

অভিমান ত্যাগ করে মাকে চিঠি দাও। দেখবে সব মীমাংসা হয়ে গেছে। আমি বসছি, তুমি লেখ। আমি হংকং থেকে হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে দেব। ফিরতি জাহাজের অপেক্ষায় তোমার মা পথ চেয়ে থাকবেন। ইউ ফট্, ইউ গেইনড্ বাট্ ইউ লস্ট্। এবার হবে মীমাংসা যার স্থায়িত্ব সুদূর প্রসারী হবে।

পারবে, পারবে বন্ধু!

হাঁ পারব। তুমি কাগজ কলম নিয়ে বস। সামান্য দুটি কথা। আমি অনুতপ্ত আমি তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই। এ সন্ টু গো ব্যাক টু মাদার। টু ওয়াইফ। টু সন্।

জর্জি কাগজ কলম নিয়ে বসল। আমার কথামত চিঠি লিখে তুলে দিল আমার হাতে। বুকে হাত রেখে বলল, উঃ কি শান্তি! আমি ফিরে যেতে চাই, ফিরে যেতে চাই মাটির কোলে, মায়ের কোঁলে, স্ত্রীর বুকে সন্তানের ছায়াতে। তুমি-ই কনসিলেট্ কর বন্ধু। আমি বিরাটের মাঝে ক্ষুদ্র হয়ে থাকতে চাই।

হংকং-এ চিঠি ডাকে দিয়েছিলাম নিজের হাতে।

ইয়োকোহামা পৌছে বললাম, ফিরতি জাহাজে বোম্বে নামবে। সোজা চলে যাবে মায়ের কাছে। ভুল যেন না হয়। মনে রেখ।

জর্জি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

সিঁড়ি দিয়ে যখন বন্দরে নামছিলাম তখনও বললাম, জর্জি, ডোন্ট ফরগেট্!

জর্জি পকেট থেকে রুমাল বের করে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বলল, আই রিমেমবার।

চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠেছিল তার।

জানিনা, নাজমাবেগম সন্তানকে ফিরে পেয়েছে কিনা! জিজা ফিরে পেয়েছে কিনা স্বামীকে, রঘুপতি তার বাবাকে!